প্রাচীনযুগ থেকে আধুনিক সময়ের কারক-বিভক্তির ধারণা

(ANTIQUITY TO MODERN TIMES BANGLA CASE AND INFLEXION CONCEPT)

Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Philosophy of Jadavpur University.

By

SOUMITRA HALDER

School of Languages and Linguistics

Jadavpur University

Kolkata

May, 2019

Declaration

08/05/2019

This thesis, titled প্রাচীনযুগ থেকে আধুনিক সময়ের কারক-বিভক্তির ধারণা **(ANTIQUITY TO MODERN TIMES BANGLA CASE AND INFLEXION CONCEPT)**, submitted by me for the award of the degree of the Master of Philosophy, is an original work and has not been submitted so far in part or in full for any other degree or diploma of any University or Institute.

Soumitra Halder

SOUMITRA HALDER

MPhil Student (2017 – 2019)

Examination Roll No: MPLI194005

Registration No: 114729 of 2011-12

School of Languages and Linguistics

Jadavpur University

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০ ০৩২, ভারত

*JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032, INDIA

SCHOOL OF LANGUAGES AND LINGUISTICS

Certificate

This is to certify that the dissertation entitled প্রাচীনযুগ থেকে আধুনিক সময়ের কারক-বিভক্তির ধারণা **(Antiquity to Modern Times Bangla Case and Inflexion Concept)** being submitted by **Soumitra Halder** for Master of Philosophy degree in School of Languages and Linguistics, Jadavpur University has been written under my supervision during the session 2018-2019. This work has not been submitted elsewhere for degree.

13/05/19

Dean
Faculty of Interdisciplinary Studies,
Law and Management
Jadavpur University

Director
School of Languages and
Linguistics
Jadavpur University

Sonia Sahoo 13/5/19

Supervisor
School of Languages and
Linguistics

PROFESSOR
Department of English
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Dean
Faculty of Interdisciplinary Studies, Law & Management
Jadavpur University, Kolkata-700032

Director
School of Languages and Linguistics
Jadavpur University

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই গবেষণার বিষয় নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে প্রথমে আমাকে উৎসাহিত করেন তত্ত্বাবধায়ক- DR. SONIA SAHOO। তিনি আমাকে গবেষণার যে কোন বিষয়কে সরল এবং সহজ ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তাই আমি আমার তত্ত্বাবধায়কের নিকট এই বিষয়ে চির কৃতজ্ঞ থাকব। এছাড়া আমার বিভাগের শিক্ষক মহাশয় DR. ATANU SAHA এবং DR. SAMIR KARMAKAR গবেষণার বিষয়ে সর্বদা অনুপ্রেরণা জাগিয়েছেন। ওনাদের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ থাকব।

আমার গবেষণার বই পত্রের ব্যাপারে সাহায্য করেছেন বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকেরা। তাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

SOUMITRA HALDER

SCHOOL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS

JADAVPUR UNIVERSITY

প্রস্তাবনা

ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম একটা অংশ হল কারক-বিভক্তি। বাংলা ভাষা বা যে কোন ভাষা নিয়ে যারা পড়েন তারা সকলেই মোটামুটি ব্যাকরণের কারকের সাথে পরিচিত। বাংলা কারক নিয়ে বেশ কিছু ভাষাবিজ্ঞানী তাদের মতাদর্শ দেখিয়েছেন। এখানে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে কারক-কে কি রকম দেখা যেতে পারে বা বর্ণনা করা যায় তা সামান্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কারকে ব্যাকরণগত দিকটা এখানে দেখানো হয়েছে। এই বিষয়টিকে নতুন ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আশা করি আপনাদের সকলের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
• ভূমিকা-	1 - 6
• প্রথম অধ্যায়- কারক-বিভক্তির ইতিহাস ও বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানীর মতামত-	7 - 27
• দ্বিতীয় অধ্যায়- বাংলা কারকের শ্রেণীবিভাগ-	28 - 33
• তৃতীয় অধ্যায়- বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে কারকের ভূমিকা-	34 - 44
• চতুর্থ অধ্যায়- কারকে ব্যাকরণগত সম্পর্ক-	45 - 54
• পঞ্চম অধ্যায়- আদি-মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা কারকের বিবর্তিত রূপ-	55 - 65
• উপসংহার-	66 - 67
• গ্রন্থতালিকা-	68 - 69

ভূমিকা

প্রথমে কারকের ইতিহাসের আলোচনার পূর্বে ভাষা ও ভাষার কাল বা সময়ের নিরূপণ সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা দরকার। নিম্নে তা দেওয়া হল—

ভাষা

ভাষাবিজ্ঞানী বলবেন, কথা বলতে পারে এমন একটি জীব হল - মানুষ। আর সেখানেই অন্য অন্য প্রাণীর থেকে সে আলাদা। অন্য অন্য প্রাণী হয়তো ধ্বনি উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য দিয়ে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। মানুষের ভাষা নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে নানা দিক দেখতে পাওয়া যায়। নানা প্রশ্ন তৈরি হয়। ভাষা ব্যাপারটি কী? কিম্বা কোথা থেকে ভাষা এলো? কেন এক এক লোক এক এক রকমভাবে কথা বলে। শব্দের মানে বদলে যায় কেন? কীভাবেই বা বদলায়। যখন চিন্তা করি তখন কি ভাষা দিয়েই চিন্তা করি! নাকি চিন্তার ফল প্রকাশ পায় ভাষার মধ্যে দিয়ে! এরকম নানান প্রশ্ন আমাদের মনে তৈরি হয়।

ভাষার মূল কাজ হল ভাবের আদান-প্রদান। আর এই ভাবের আদান-প্রদান ভাষা ছাড়াও হতে পারে। আকার ইঙ্গিতের মাধ্যমে হতে পারে। বাগযন্ত্র থেকে উচ্চারিত ধ্বনি বা ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে হতে পারে। আমরা এই বিষয় নিয়ে এত মাথা ঘামাই না। ভাষাতাত্ত্বিকরা এদিক থেকে পৃথক। সভ্যতার সম্পদ মানব ভাষার প্রকৃতি, তার বিবর্তন, তার সৃষ্টিশীলতা, সমাজ জীবনে তার স্থান- এসবই পর্যালোচনা করেন তাঁরা। কখনও কখনও ভাষায় সূত্রে তাঁরা প্রাচীন জীবনচর্চার বিভিন্ন দিক সৃষ্টি করে থাকেন।

আমাদের দেশে ভাষাচর্চার একটি গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাস আছে, যা পাণিনির ‘ অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে’ শীর্ষস্থান স্পর্শ করেছিল। সম্ভবত বইটি লেখা হয়েছিল (খ্রীস্টপূর্ব ৩৫০-২৫০) এর মধ্যে। ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অবশ্যই লিখেছেন, ‘In the 5th Century B.C; the great grammarian Panini wrote his Astadhyayi’। অধ্যাপক R.H. Robin এই বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন এ বইটি ‘The earliest scientific work in any Indo-European language’। বোঝা যাচ্ছে পাণিনির ব্যাকরণ প্রাচীন ভারতে শুধু নয়, প্রাচীনকালের সমগ্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ভাষাবিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে ছিল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণার বিকাশ হয় আধুনিক কালেই;

তবু মানুষের ভাষাজিজ্ঞাসা ভারতবর্ষ এবং পাশ্চাত্যে বহু প্রাচীন কালেই সূচিত হয়েছিল। এমনকি, প্রাচীন ভারতে পাণিনি-প্রমুখ মনীষীরা তাঁদের ভাষাবিষয়ক আলোচনায় যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালে 'ভাষাবিজ্ঞান' (Linguistics), 'ভাষাতত্ত্ব' 'বাঙ্‌মীমাংসা' (Philology) প্রভৃতি শব্দের প্রচলন হয়নি। তখনকার ভাষাবিষয়ক আলোচনার নীতি-পদ্ধতিও ছিল খানিকটা স্বতন্ত্র ধরনের। যেরূপে সেকালের ভাষাবিষয়ক আলোচনার বিশেষ বিকাশ হয়েছিল তাকে ভারতবর্ষে সাধারণত 'ব্যাকরণ' বলা হত। কেউ কেউ তাকে 'শব্দবিদ্যা'ও বলেছেন। আর পাশ্চাত্যে বলা হত 'Grammar'। সেই থেকে ভাষা-বিশ্লেষণমূলক আলোচনার সাধারণ নাম দাঁড়িয়ে গেছে ব্যাকরণ বা Grammar। কথাটি এখন ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ Linguistics বা বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞান অর্থেও ব্যবহার করে থাকেন।

কিন্তু মধ্যযুগে ব্যাকরণ বা Grammar শব্দের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তখন ব্যাকরণ বা Grammar বলতে নির্দেশমূলক (normative) বা বিধি নিষেধ মূলক (prescriptive) ব্যাকরণ বোঝাত। কারণ ভাষাকে আমরা লোকমুখে বাস্তব ব্যবহারে কি রূপে পাচ্ছি তা বিশ্লেষণ না করে ভাষার শুদ্ধ মার্জিত রূপ কি হওয়া উচিত, সেই শুদ্ধ রূপ অর্জনের জন্য আমাদের কোন কোন অশুদ্ধ রূপ সংশোধন করতে হবে, এইটা নির্দেশ করাই মধ্যযুগে ব্যাকরণের উদ্দেশ্য হয়ে উঠে।

আমরা জানি, ভাষা মাত্রেই প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবর্তনশীল। বৈদিক ভাষার স্বাভাবিক যুগগত পরিবর্তনকে বিকৃতি মনে করে সেই বিকৃতি রোধ করার জন্যে যখন ভারতীয় মনীষীরা তৎপর হয়ে উঠলেন তখনই সংস্কৃত ব্যাকরণগুলি রচিত হল। সুতরাং ভারতবর্ষে ব্যাকরণ মূল উদ্দেশ্যের মধ্যেই সেই শুদ্ধিবাদী নির্দেশমূলক মনোভাবটি ছিল। তবু পাণিনি আদর্শ সংস্কৃত ভাষার যে রূপ-বিশ্লেষণ করেছেন তাতে সেকালের পক্ষে অপ্রত্যাশিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। পাশ্চাত্যেও প্রথমে গ্রিক-লাতিন ভাষার বাস্তব (positive) বিশ্লেষণ থেকেই সূত্র রচনা করে ব্যাকরণের জন্ম হয়েছিল। তার পরে মধ্যযুগে তার যান্ত্রিক অনুসরণের ফলে ব্যাকরণ সম্পর্কে নির্দেশমূলক দৃষ্টিভঙ্গিটি গড়ে উঠে। কিন্তু আধুনিককালে ভাষার বিশ্লেষণ, বর্ণনা এবং ব্যাখ্যাই ব্যাকরণের তাৎপর্য হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যারা ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন, তাঁরা নির্দেশমূলক দিকটির উপরে গুরুত্ব দেননি, তুলনামূলক বাস্তব বর্ণনাই তাঁদের ব্যাকরণের উদ্দেশ্য ছিল।

ভাষা ব্যাকরণ সময়ের নিরিখে ভালোভাবে বোঝার জন্য একটি উদাহরণ দিয়ে দুই ধারার দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির পার্থক্য আলোচনা করা যায় এইরকম। ভাষার বিভিন্ন উপাদান হল ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি। এ গুলোকে বর্ণনামূলক ও ঐতিহাসিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিশ্লেষণ করা যায়। 'আমি' শব্দটির এখনকার গঠন বর্ণনামূলক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শব্দটি কয়েকটি ধ্বনি নিয়ে গঠিত। যেমন— আমি= আ+ম্ +ই। বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শব্দটির গঠন আপাতত এইভাবে বর্ণনাই যথেষ্ট; অতীতে শব্দটির কি রূপ ছিল তা বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শব্দটির সম্পর্কে আলোচনা হবে অন্যরকম।

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে 'আমি'র সংস্কৃত রূপ 'অস্মাভিঃ' ('অস্মদ্' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনের রূপ)। 'অস্মাভিঃ পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃত ভাষায় হল 'অম্হাহি', তা থেকে অপভ্রংশে হল 'অম্হহি'। আবার শব্দটির কারকভেদে পৃথক রূপও বর্ণনামূলক ও ঐতিহাসিক উভয় প্রকার ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা-আলাদা ভাবে আলোচিত হতে পারে। বিভিন্ন কারকে 'আমি' শব্দের শুধু একবচনের রূপই আপাতত দেখা যাক: কর্তৃকারক= আমি ; কর্মকারক ও সম্প্রদানকারক= আমাকে ; করণকারক= আমার দ্বারা ; অপাদানকারক= আমা হতে, আমা থেকে; সম্বন্ধ পদ= আমার; অধিকরণকারক= আমাতে, আমার মধ্যে। পদগুলি বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করলে রূপগুলির বর্ণনা দাঁড়াবে এইরকম—

মূল শব্দ 'আমি'। কর্তৃকারকে আমি+শূন্য-বিভক্তি। কর্ম, সম্প্রদান, করণ, অপাদান ও অধিকরণে রূপতত্ত্ব প্রভাবিত ধ্বনি পরিবর্তন (morphophonemic change) হয়ে মূল শব্দটি হয়ে গেছে 'আমা'। তার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কারকের বিভক্তি-চিহ্ন বা অনুসর্গ এইভাবে বিশ্লিষ্ট হবে-

কর্ম ও সম্প্রদান= আমা+কে; করণ= আমা+র দ্বারা (অনুসর্গ);

অপাদান= আমা হতে (অনুসর্গ); সম্বন্ধ পদ= আমা+র;

অধিকরণ= আমা+তে ।

মোটামুটি এই হল বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণের-ফল।

ভাষাকালের নিরূপণ ব্যাখ্যা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা দিয়ে আমার মূল বিষয়ে প্রবেশ করব। তার আগে এই সময় সম্পর্কে ধারণা একটু জানা দরকার তা নিম্নে দেওয়া হল—

প্রাচীন বাংলা— মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার পূর্বী-প্রাচ্যা বা মাগধী অপভ্রংশ থেকে ভাষার উদ্ভব। দশম শতকেই সম্ভবত নব্য ভারতীয় আর্যভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আদিযুগেই বাংলা কথ্যভাষা সহজিয়া বৌদ্ধদের হাতে সাহিত্যে সমাদর পেয়েছে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে তিনটি স্তরে বিকশিত বলে দেখানো হয়। (১) প্রাচীন বাংলা, (২) মধ্য বাংলা ও (৩) আধুনিক বাংলা ।

যদি প্রাচীন বাংলার কথা বলি তাহলে চর্চাপদের ভাষা আমাদের অন্যতম। এছাড়া প্রাচীন বাংলা ভাষার চর্চাপদ ছাড়া আর কোন বইয়ের সন্ধান সে রকম পাই না। চর্চাপদ সম্পর্কে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন যে, এই গ্রন্থের ভাষা বাংলাই এবং আদিস্তরের বাংলা। এই সম্পর্কে কিছু কারক ও বিভক্তির লক্ষণ তিনি দেখিয়েছেন তা হল-

যেমন- সম্বন্ধ পদে- এর , অর। চর্চাপদে এগুলো ব্যবহার হয়- দোম্বীর পদে– হরিণার [এর বিভক্তি] ,আবার সম্প্রদানে গৌণকর্মে- রে বিভক্তি ইত্যাদি দেখা যায়।

মধ্যে মধ্যে অপভ্রংশের কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়।

যেমন- কর্তায়-/উ/ বিভক্তি , সম্বন্ধ পদে – /ক/ বিভক্তি (ছান্দক বান্ধ) এবং /হ/ বিভক্তি (খেনহ, ছাড়অ), কর্মবাচ্যে - /ইজ/, সর্বনাম /গো/, /সো/, /কো/, /জসু/, /তসু/, /জৈসন/ /তৈসন/ ইত্যাদি চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এইগুলির জন্য ভাষা যে অপভ্রংশ তা মনে করবার কোন কারণ নেই। অপভ্রংশ তখনকার দিনে লেখ্য ভাষা, কথা বাংলার নতুন পদক্ষেপে স্বভাবতই কিছু অপভ্রংশের চিহ্ন থেকে গেছে। অপভ্রংশ ভাষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় একটু জানা দরকার। [অপভ্রংশ (Apabhramsa) — বিশুদ্ধ সংস্কৃতের আদর্শ থেকে লোক ভাষা গড়ে উঠেছিল, (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) তাকে ‘অপভ্রংশ’ বলেছেন। সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলি হল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় এবং অপভ্রংশ হল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় স্তর, আর অপভ্রংশেই শেষ স্তরের নাম অপভ্রষ্ট। সাহিত্যের ভাষারূপে অপভ্রংশ-অবহ্ঠের সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় কালিদাসের ‘বিক্রমবর্ষী’ ইত্যাদি। এর রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হল— (ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ করণ কারকের একবচনের বিভক্তি ছিল ‘এন’। অপভ্রংশে তার নানাবিধ পরিবর্তিত রূপ

(-এণ, -এণং, ইণ, -ইণং) ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন- তেণ, তেণং, তিণ, তিণং। (খ) অপাদান কারকে 'হে' ও 'হুং' দু'টি বিভক্তিই একবচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত হত। যেমন— বৃক্ষাৎ, বৃক্ষেভ্যঃ > রুচ্ছহে, রুচ্ছহুং। (গ) অধিকরণের বিভক্তি ছিল '-হি' '-হিং'। যেমন— বৃক্ষস্মিন্ >রুচ্ছহিং, ইত্যাদি।]

মধ্য বাংলা—

সময় নিরিখে প্রাচীন বাংলার পরেই মধ্য বাংলা বলে নিরূপণ করা হয়েছে। মধ্য বাংলা সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে, মধ্য বাংলার আরম্ভ মোটামুটি ১৩৫০ শতাব্দী থেকে, শেষ ১৮০০ শতাব্দী। এর পূর্বের একটি স্তর ১২০০ থেকে ১৩০০ শতাব্দী যুগান্তরীয় পর্ব বা অন্ধকার যুগ, একে প্রাচীন বা মধ্য বাংলা বলা চলে, কারণ এই সময়ের কোন নমুনা পাওয়া যায়নি তুর্কী আক্রমণের জন্য। মধ্য বাংলার পর্বকে দু'টি অনুপর্বতে ভাগ করা হয়- (১) আদি-মধ্য বাংলা ১৩৫০ থেকে ১৫০০ শতাব্দী এবং (২) অন্ত্য-মধ্য বাংলা ১৫০০ থেকে ১৮০০ শতাব্দী। মধ্য বাংলায় বহু রচনার পূর্ব রূপ যুগান্তরীয় বাংলায় ছিল। যেমন, ময়ূর ভট্ট, মানিক দত্ত ইত্যাদি রচনা এবং লাউসেন ও চণ্ডীমঙ্গলের কথা আদি-মধ্য বাংলার স্তরে রচিত হয়েছিল। অনেকের মতে মানিকচন্দ্রের রাজার গান, ময়নামতীর গান, শূন্যপুরাণ, ডাক ও খনার বচন ইত্যাদিও আদি-মধ্য বাংলায় রচিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে তাদের ভাষার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, তাদের অন্ত-মধ্য বাংলার ভাষা থেকে আলাদা করার কোন উপায় নেই।

(ক) আদি-মধ্য বাংলা (Early Middle Bengali)—

মধ্য বাংলার পর্বকে দুটি পর্বাঙ্গে ভাগ করা হয়- (ক) আদি-মধ্য বাংলা এবং (খ) অন্ত্য-মধ্য বাংলা। আদি-মধ্য বাংলায় রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতেরও অনুবাদ হয়েছিল। আদি-মধ্য বাংলার স্থিতিকাল আনুমানিক ১৩৫০ শতাব্দী হতে ১৪৫০ শতাব্দী পর্যন্ত। চতুর্দশ শতাব্দে ও পঞ্চদশ শতাব্দে লেখা বলে নিশ্চিতভাবে নেওয়া যেতে পারে এমন কোন রচনায় মেলে না। সুতরাং ১৩৫০ হতে ১৪৫০ অবধি শতাব্দ কালের কতটা প্রাচীন বাংলার অন্তর্গত ছিল এবং কতটা আদি-মধ্য বাংলার অন্তর্গত ছিল তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। প্রায় সব প্রাচীন রচনাই অষ্টাদশ শতাব্দে নকল করা পুথিতে পাওয়া গিয়েছে। তাই পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের ভাষার পরিপূর্ণ রূপটি এগুলিতে প্রতিফলিত নয়। তবে

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি তেমনি পুরানো না হলেও মূলে হস্তক্ষেপ খুব বেশি না পড়ায় আদি-মধ্য বাংলার পরিচয় খানিকটা পাওয়া যায়।

(খ) অন্ত্য-মধ্য বাংলা (Late Middle Bengali)—

আনুমানিক ১৫০০ শতাব্দী থেকে ১৭৬০ শতাব্দী। এই উপপর্বের ভাষার সমৃদ্ধ নিদর্শন মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারা, বৈষ্ণব সাহিত্য রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। এই সময়ের বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী পদান্তিক স্বরধ্বনির লপ-প্রবণতা (রাম>রাম্), মধ্যস্বরের লোপের ফলে দ্বিমাত্রিকতা (ভাবনা>ভাব্না, গামোছা>গাম্ছা), অপিনিহিতি (কালি>কাইল, করিয়া>কইর‍্যা), বিশেষ্যের কর্তৃকারকের বহুবচনে –রা বিভক্তি, নামধাতুর ব্যবহার (নমস্কার>নমস্কারিলা), আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ও বৈষ্ণব কবিতায় ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি।

আধুনিক বাংলা (Modern Bangla)—

১৭৬০ শতাব্দী পরবর্তী সময়কে আধুনিক সময় বলা হয়। এই সময়ে বাংলার নিদর্শন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দের ও খ্রিস্টান মিশনারীদের রচিত বাংলা গ্রন্থ, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিকের রচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব সাহিত্যিকের রচনায় বাংলার জনসাধারণের মুখের ভাষার নিদর্শন সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সাহিত্যিক ভাষামাত্র। আধুনিক কালের বাঙ্গালির মুখের ভাষার প্রধান পাঁচটি আঞ্চলিক রূপ বা উপভাষাগুচ্ছ আছে। সেগুলি হল— মধ্য পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা ‘রাঢ়ী’, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গের (ও অংশত বিহারের) উপভাষা ‘ঝাড়খণ্ডী’, উত্তরবঙ্গের উপভাষা ‘বরেন্দ্রী’, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা ‘বঙ্গালী’ এবং উত্তর-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা ‘কামরূপী’ বা ‘রাজবংশী’। আধুনিক বাংলা ভাষার দু’টি প্রধান বিশেষত্ব হল সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা এবং সাহিত্যে গদ্যরীতির ব্যাপক ব্যবহার। এইভাবে আধুনিক ভাষার ব্যবহার হতে শুরু করল। ভাষাকালের যুগ বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে আলোচনা করা হল।

প্রথম অধ্যায়

কারক-বিভক্তির ইতিহাস ও বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানীর মতামত

এবার আমার গবেষণার মূল বিষয়ের আলোচনা শুরু করলাম। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের কারক বিভক্তি জানতে হলে অবশ্যই এদের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান থাকা গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিয়ার সঙ্গে পদের পরস্পরের বা পারস্পরিক সম্পর্ক কে আমরা এককথায় কারক বলে থাকি। তবে ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে কারক হল " any grammatical function or syntactical relationship of forms or parts of speech"। এই হিসেবে সম্বন্ধ হল পদ কারক নয়। কারকে সম্বন্ধকে পদ হিসেবে ধরা হয়।

"ব্যাকরণগত আচরণের দিক দিয়ে প্রাচীন বাংলা থেকেই সংস্কৃতে সাতটি কারকের ব্যবহার প্রচলিত আছে, যথা— কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান/গৌণকর্ম, অপাদান, অধিকরণ কারক এবং সম্বন্ধ পদ। গঠন-প্রকৃতির দিক দিয়ে কিন্তু কারকের সংখ্যা তিনটি—

(ক) মুখ্য কারক (Direct Case)— প্রথম বিভক্তি ও দ্বিতীয় বিভক্তি মিলে মুখ্য কারক।

(খ) গৌণ বা তির্যক কারক (Oblique Case)— সপ্তমী এবং সমীকৃত তৃতীয় বিভক্তি মিলে গৌণ কারক। বিভক্তি— এ, এঁ। কর্তৃকারকে গৌণ বিভক্তি যুক্ত হতে পারে। যেমন— রামে যায়।

(গ) সম্বন্ধ কারক— কেবল মাত্র প্রাচীন বাংলাতে পাওয়া যায়।"[1]

মুখ্য কারকের মূল সম্পর্ক ক্রিয়ার সঙ্গে, ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে কর্তা। গৌণ কারকের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়, গৌণ কারক সেখানে ক্রিয়ার আশ্রিত বা আধার। কর্তৃকারক প্রধানত মুখ্যকারক কিন্তু গৌণরূপেও সে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত হতে পারে।

সেক্ষেত্রে কর্তা হল গৌণ কর্তা। এ পার্থক্য প্রাচীন বাংলায় ছিল, এখনও কিছুটার ব্যবহার বাক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

চর্চাপদে দেখি— 'সরহ ভণই' (<সরহকঃ ভণতি, কর্তৃকারক) কিন্তু 'চোরে নিল' (চৌরেণ নীতম্, গৌণ কর্তা);

[1] । বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন- উদয়কুমার চক্রবর্তী [২০১২ : ৯৯]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যেমন— 'না ছাড়ে নান্দের পোএ' (কর্তৃকারক), কিন্তু 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে' (গৌণ কারক)।

তবে আধুনিক ভাষার সঙ্গে প্রাচীন ভাষার পার্থক্য হল— এখন গৌণ কর্তা অনির্দেশক (Indefinite) ভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা— লোকে বলে, শাস্ত্রে বলে, বাঘে মানুষ খায়, ইত্যাদি।

এবার কিছু সাহিত্যিক ও ভাষাবিজ্ঞানীদের মতামত পোষণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব কিছু মতামত পোষণ করার চেষ্টা করব। প্রথমে সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেনের কারক ও বিভক্তির মতামত নিয়ে বলব—

দীনেশচন্দ্র সেন

গৌড়ীয় ভাষা সংস্কৃত বা প্রাকৃত হতে আসেনি, অপর কোন অনার্য ভাষা হতে এসেছে, কয়েকজন এইরূপ মত প্রচার করেছিলেন তা হল— ল্যাথাম, এন্ডারসন ইত্যাদি দের মতাবলম্বী। এরা বলেন— "বঙ্গীয়, হিন্দী কি অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষায় আদি কালে সংস্কৃতের সাথে কোন সংস্রব ছিল না। বিভক্তি ছত্রগুলির গঠন দ্বারাই কোন ভাষার আদি নির্ণয় সঙ্গত, কেবল শব্দগত সাদৃশ্য দেখে সহসা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয়।"[2] তাঁরা বলেন, আর্য্যজাতি ক্রমে দক্ষিণ পূর্বে অবতরণ করে উপনিবেশ স্থাপন করেন। সংস্কৃত প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল ভাষার বহুল পরিমানে সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করে। কিন্তু বিভক্তির লক্ষণ বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে আদিম অনার্য সম্বন্ধ অদ্যাপি বর্তমান।

বিভক্তির মতামত— বাঙ্গালা প্রথমা বিভক্তির সংস্কৃতের মত, অনুস্বার কি বিসর্গবর্জিত হয়, এই প্রভেদ। কিন্তু তথাপি ইহা যে প্রাকৃতের অবস্থা অতিক্রম করে এসেছে, তা স্পষ্টই দেখা যায়। প্রথমা একবচনে কোথাও 'এ' সংযুক্ত দেখা যায়। যথা—

"শুজণে খু, ভিচ্চাণুকম্পকে শামিএ নিদ্বণকে কি শোহদে।" (মৃচ্ছকটিক তৃতীয় অঙ্ক)

প্রাকৃত ঐরূপ 'এ' অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। এই 'এ' বাঙ্গালা কর্তৃকারকে পূর্বে ব্যবহৃত হত। যথা—

[2]। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য- দীনেশ চন্দ্র সেন [১৩৬৭ : ৩৭-৪৫]

১। "শুনিয়া রাজাএ বোলে হইয়া কৌতুক।

সুগন্ধা অপছরা কেন হৈল মৃগরূপ।।" (কবি সঞ্জয়, মহাভারত আদি খণ্ড)

২। "কদাচিৎ না দেখিছ হেনরূপ ঠান।

কোন মতে বিধাতাও করিছে নির্ম্মাণ।।" (রামেশ্বরী মহাভারত, বে.গ. পুঁথি ৮৬ পত্র)"

আবার বাঙ্গালার পূর্বে 'ক' সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মত ছিল। পূর্ববঙ্গে ২০০ বৎসরের পূর্বের পুঁথিগুলিতে এই 'ক' এর প্রয়োগ অসংখ্য। দীনেশ চন্দ্র মহাশয় এই স্থলেও কয়েকটি ছত্রের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন। যথা—

১। "রথ হৈতে ফাল (লাফ) দিয়া চক্র লৈয়া হাতে।

ভীষ্মক মারিতে যায়, দেব জগন্নাথে।।"— (কবীন্দ্র)

২। "সে যে ভার্য্যা অনুক্ষণ পতিক সেবয়"— (সঞ্জয়)

এইভাবে কর্তা এবং কর্ম উভয় স্থলে 'ক' থাকিলে কোনটি কর্তা, কোনটি কর্ম পরিচয় পাওয়া কঠিন। "সৌরন্ধ্রক কীচক বোলয়ে ততক্ষণ"— ছত্রে কে কাহাকে বলিল, নির্ণয় করা সহজ নয়। সেই জন্য কর্ম ও সম্প্রদানে বাংলায় 'ক'র ব্যবহার পরে প্রচলিত হল। গাথা ভাষায় ও প্রাকৃতে মধ্যে 'কে'র প্রয়োগ দৃষ্ট হয় প্রাকৃতে—

"পলিত্তাঅদু দাশীএ পুত্তে দলিদ্দ-চালুদত্তাকে তুমং"— (মৃচ্ছকটিক ৮ম সংখ্যা অঙ্ক)

কোন কোন স্থলে বাংলা কর্মকারকে কোন বিভক্তির লক্ষণ প্রযুক্ত হয় না। যথা— আম গাছ কাটিয়াছে। এইরূপ ব্যবহার ও পূর্বোক্ত 'ক' যুক্ত ব্যবহারের সহিত পূর্বে কোন পার্থক্যই ছিল না, উহা শব্দের অন্ত্যবর্ণ মাত্র ছিল। এই জন্য প্রাচীন কালে কর্ম ও সম্প্রদানে ব্যতীত অন্য বিভক্তিতেও 'কে' ব্যবহৃত হত। যথা—

"মথুরাকে পাঠাইল রূপ সনাতন।" (চৈতন্যচরিতামৃত আদি, ৮ম পর্ব) ইত্যাদি।

দীনেশচন্দ্র সেনের কারক আলোচনায় দেখলাম তিনি মূলত প্রাচীন বাংলার কারক-বিভক্তি নিয়ে বলেছেন। প্রাচীন বাংলায় বিভক্তির প্রয়োগ প্রভেদ কোথায় তা দেখিয়েছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে– বাংলা ব্যাকরণ অংশে কারক-বিভক্তি আলোচনা রয়েছে। তা নিম্নে আলোচনা করা হল—

"বাংলা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা, ইহা যে পালি মাগধী অর্ধমাগধী সংস্কৃত পারসি ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে। সংস্কৃতে ব্যাকরণকারেরা অনেক ভেবে চিন্তে দেখলেন, পদ দুই প্রকার- সুবন্ত ও তিঙন্ত। তাঁদের সংস্কার "নাপদং শাস্ত্রে প্রযুজ্ঞীত" বিভক্তি যুক্ত না হলে ধাতু ও শব্দ শাস্ত্রে প্রয়োগ করা যায় না; সুতরাং ধাতুর উত্তর তিবাদি বিভক্তি এবং সর্বপ্রকার শব্দের উত্তর সুবাদি বিভক্তি হয়, এই তাঁদের ব্যবস্থা, তাঁরা অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি করে লোপ করবেন, কিন্তু বিনা বিভক্তিতে শব্দ প্রয়োগ করতে পারা যায়, ইহা কিছুতেই স্বীকার করতে প্রস্তুত হবেন না।"[3]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ব্যাকরণ শাস্ত্রের কারক-বিভক্তি আলোচনা করতে গিয়ে একটু কটূক্তির সুর করে তখনকার ব্যাকরণকারদের বলেছেন। " যেমন— সুবুদ্ধি বালক যদি জিজ্ঞাসা করে, 'রাম রাবণ কে মারিলেন' 'কেশব আম খাইলেন' এ সকল স্থলে 'রাম', 'কেশব' ও 'আম' কেন অব্যয় শব্দ হবে না, তা হলে ব্যাকরণকারেরা অবাক। সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণকারেরা বিভক্তি দেন; সুতরাং তাদেরকে বিভক্তি দিতে হবে।"

কারক অর্থ-সাপেক্ষ, বিভক্তি শব্দ-সাপেক্ষ। সংস্কৃতে অনেকগুলি বিভক্তি আছে, অনেকগুলি কারক আছে; কারক ভিন্ন নানা সম্বন্ধে নানা কারণে নানা বিভক্তির উৎপত্তি হয়, সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণে কারক ও বিভক্তি দুইটি স্বতন্ত্র রাখা প্রয়োজন হয়েছে।

যেমন— "সংস্কৃতে কারকের লক্ষণ স্বতন্ত্র, ক্রিয়ার সহিত অন্বয় না হলে কারক বলা যায় না, কিন্তু ইংরেজি case এর লক্ষণ অন্য রূপ, নাউনের কন্ডিশন দেখিয়ে দিলে case হয়, সুতরাং case-এ ও কারকে আকাশ পাতাল তফাত। ইংরেজিতে পসেসিভ কেস, সংস্কৃতে ইহা কারক নয়; কিন্তু অনেক বাংলা ব্যাকরণে সম্বন্ধ পদ কারক রূপে বিরাজ করেছেন। ইংরেজিতে বিভক্তি বলে জিনিস এক। পসেসিভের আপস্ট্রফি এস্ আছে, আর বহুবচনে কিছু পরিবর্তন আছে; সুতরাং কর্ম বাচ্য স্থলে ইংরেজিতে মোটামুটি কর্তাকে নমিনেটিভ কেস্ই বলে; কিন্তু সংস্কৃতে কর্মবাচ্যের সাবজেটকে ঐরূপে কর্তাকারক বললে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড উপস্থিত হয়; কিন্তু আমরা দুই-চারিখান ব্যাকরণ দেখিয়েছে তাতে একেবারে বিভক্তির

[3] । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (২য় খণ্ড)- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী [২০০০ : ৫৯৩-৬০৭]

নাম নাই। মাঝে মাঝে আছে, কর্তা কারকে অধিকরণ কারক হয়; যথা— 'ছাগলে পাতা খায়', করণ- কারকেও অধিকরণ কারক হয়; যথা— 'ছুরিতে কাটে' 'মুখে খায়' ইত্যাদি।"

ওনার এই লেখা থেকে বোঝা যায়, শুদ্ধ বা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার কারক-বিভক্তির সম্পর্কে। আবার তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্য বলেছেন— "এইরূপে কারক ও বিভক্তিতে গোলযোগ করে অনেক ব্যাকরণেই ছেলেদের মনে একটা ত্রাস জন্মায়। কিন্তু যদি বিভক্তিও কারক স্বতন্ত্র রেখে তাদের কার্য লক্ষণ প্রয়োগ প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে দেখিয়ে দেওয়া যায়, কোন কারকে কোন বিভক্তি হয়, কোন্ শব্দের যোগে কোন্ বিভক্তি হয়, কোন্ অর্থে কোন্ বিভক্তি হয়। এইগুলি ভালো করে দেখে দিলে প্রণালী শুদ্ধরূপে বালকদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে।"

বিভক্তির আকার নিয়ে কত গোলযোগ আছে। কেহ লেখলেন, বিভক্তির আকার এইরূপ—

প্রথমা :	রা
দ্বিতীয়া : কে রে য়তে	দিগকে দেয়
তৃতীয়া : দ্বারা	দিগের দ্বারা
দিয়া এ য়	দিগকে দিয়া
চতুর্থী : কে	দিগকে
পঞ্চমী : হইতে	দিগের হইতে
থেকে	দিগের থেকে

ইত্যাদি। কেউ বা প্রথমা বিসর্গের পরিবর্তে ফাঁক দিয়ে থাকেন। সংস্কৃতে যেমন বিভক্তির রূপগুলি আছে, বাংলায় সেইরূপ থাকা চাই, নইলে চণ্ডী অশুদ্ধ হবে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুসর্গে যোগে বিভক্তির যে আলোচনা করেছেন তা হল— "আমরা জিজ্ঞাসা করি 'দ্বারা' 'দিয়া' বিভক্তি হল কিরূপে? শব্দের সঙ্গে জমাট না বাঁধিলে বিভক্তি হয় না। 'আমাদিগের দ্বারা' 'আমার দ্বারা' দিব্য সম্বন্ধ পদ রয়েছে, কেমন করে বলব উহা বিভক্তি? 'ছুরি দিয়া কটিবে' এ স্থলে 'দিয়া' অসমাপিকা ক্রিয়া; কর্ম 'ছুরি', কী বলে 'দিয়ে' কে করণের বিভক্তি বলিব? অথচ সকল ব্যাকরণেই দেখি 'দিয়া' করণের বিভক্তি। কেমন করে বলিব ব্যাকরণকারেরা ব্যাকরণ লিখিবার সময় মস্তিষ্ক বিলোড়ন করেন। তার পর

আবার ‘দিগকে’ বিভক্তি করা হয়েছে, কিন্তু ‘দিগকে’ কি আমরা কখনো ব্যবহার করি? পশ্চিম রাঢ়ে ‘দিগ্‌গে’ একটা কথা আছে বটে, আমাদেরও পুরানো দলিলা দিতে ‘আমার দিগরের’ দেখতে পাই বটে, কিন্তু ‘দিগকে’ কখনো দেখতে পাই না, কখনো বলিও না। যখন ‘আমার দিগরকে’ ব্যবহার করত, তখন ‘দিগর’ বিভক্তি ছিল না। ‘দিগর’ পারস্য শব্দের অর্থ হল গণ। যদি বিভক্তি বলতে হয়, যে টুকু জমাট বাঁধে, সেই টুকু হল ‘দের’। বিভক্তি বলতে গেলে ‘দের’ কেই বলতে হয়। কিন্তু সে ‘দের’ কর্মের বিভক্তি, সম্বন্ধের বিভক্তি, অধিকরণেরও বিভক্তি।”

তার এই যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে অনুসর্গ বিভক্তির ঘোলাটে ভাবটা কাটাতে চেয়েছেন। আবার তিনি ‘বিভক্তির’ শব্দ-বিভাগ নিয়ে একটি সূক্ষ্ম ধারণা দিয়েছেন। তা হল—

“শব্দবিভাগ সম্বন্ধে একটি কৌতুকের কথা মনে পড়ে গেল। একজন সুবুদ্ধি বাংলা ব্যাকরণকার প্রাতিপদিকের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে দেখলেন, একজাতীয় শব্দ বিভক্তি যুক্ত হলেও বিকৃত হয় না, সংস্কৃতে তাদের অব্যয় বলে। সেই জন্য যারা বিকৃত হয়, তিনি তাদেরকে সব্যয় বলেন। সব্যয় শব্দ না আছে সংস্কৃতে না আছে বাংলায়। যদি বা সংস্কৃতে ব্যবহার করা যায়, তাহলেও তার অর্থ তিনি যা করেছেন তা কোনো ক্রমেই হয় না। বাস্তবিক বাংলায় তিন-চারটে বৈ বিভক্তি নেই। তার মধ্যে আবার ‘এ’ বিভক্তিটি সকল কারকেই হয়, সুতরাং সংস্কৃতের মতো প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী ইত্যাদি এবং একবচন, বহুবচন করে একটা লম্বা গাছ আঁকবার প্রয়োজন কী? ইংরেজিতে বিভক্তি দুটি বৈ নেই, বাংলায় চার-পাঁচটি আছে, সুতরাং বিভক্তিটা একেবারে লোপ করলে চলবে না। বিশেষ যখন বিভক্তি শব্দের অঙ্গ ও কারক অর্থের অঙ্গ, তখন ও দুটো বাল্যকাল হতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করে দেখে দেওয়া উচিত ইত্যাদি।”

তার এই শব্দ বিভক্তির ধারণা একটু অন্যরকম ভাবে জানলাম। কিন্তু আমরা শব্দ বিভক্তির সম্পর্কে যে ধারণা জানি যে, শব্দ বিভক্তি যুক্ত হলে, শব্দ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে পরিণত হয়। বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচন ও কারক বিভক্তি দ্বারা প্রকাশিত হয়; যথা— তাদের, চাঁদের, সকলকার, ঘরে, বাড়িতে, হাতে ইত্যাদি। সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যবহৃত শব্দ বিভক্তির একটি নাম হচ্ছে সুপ্; বিভক্তি-যুক্ত নাম বা সর্বনাম পদকে এই জন্য সুবন্ত (সুপ+অন্ত) পদ বলে। শব্দের অর্থমূলক শ্রেণী বিভাগ যেমন— ১) যৌগিক বা যোগ শব্দ ২) রুঢ় বা রুঢ়ি শব্দ ৩) যোগরুঢ় শব্দ ইত্যাদি।

সুকুমার সেন

সুকুমার সেনের মতে, "বাক্য হল পদ সমষ্টি। বাক্যে মধ্যে ক্রিয়াপদের সহিত বিশেষ্য (ও সর্বনাম) পদগুলির যে 'অন্বয়' (Concord, অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্ক) তাকে বলে কারক। বিভক্তি হল কারক সূচক ধ্বনিসমষ্টি বা পদাংশ (Case-termination)। এই কারকের মধ্যে বিভিন্ন প্রয়োগ-রীতির (বা ইডিয়মের) উদ্ভব হওয়ার ফলে বিভিন্ন যোগ হওয়ায়, এবং একই বিভক্তির সাহায্যে একাধিক কারকের অর্থ প্রকাশ প্রায়ই দেখা গেলেও, মোটামুটি বলা যায় যে বিশেষ বিশেষ কারকের চিহ্ন হল বিশেষ বিশেষ বিভক্তি। সংস্কৃতে সম্বোধন পদ ছাড়া সাতটি "কারক" আছে তা হল— কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ ও সম্বন্ধ। এই সাত কারকের সাতটি বিভক্তি শুধু একবচনে অ-কারান্ত শব্দেই দেখা যায় অন্যত্র ছয়টি। দ্বিবচনে সর্বত্র তিনটি বিভক্তি, বহুবচনে ছয়টি। প্রাকৃতে কারক-পদের সংখ্যা কমে গিয়েছে, অপভ্রষ্ট দাঁড়িয়েছে তিনটিতে। বিভক্তি ধরে বিচার করলে পুরানো বাঙ্গালাতেও কারক প্রধানত তিনটি— (১) কর্তা-কর্ম (২) করন-অধিকরণ, এবং (৩) সম্বন্ধ। (দুই একটি গৌণ- কর্ম ও অপাদান কারকের প্রাচীন পদ প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেগুলি ধর্তব্য নয়)। আধুনিক বাঙ্গালায় কারক চারটি— (১) কর্তা, (২) কর্ম (৩) করণ-অধিকরণ ও (৪) সম্বন্ধ।"

সুকুমার সেনের মতো এখনকার আধুনিক ব্যাকরণকারেরা এই চারটি কারকের কথা বলেছেন। কেউ কেউ আবার অনুসর্গ যোগে কারকের ব্যবহার দেখিয়েছেন। এই নিয়ে প্রাচীন থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত কারকের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। এতে প্রয়োগ বিধির নিয়মও দিন দিন বাড়ে।

উপভাষার ক্ষেত্রে বিভক্তির নিয়ম একটু অন্যরকম। সুকুমার সেন যেমন এর প্রয়োগ দেখিয়েছেন—

"আধুনিক বাংলায় (সাধু ও চলিত ভাষায়) কর্তৃকারকে [-এ (-ইয়),-তে] বিভক্তির ব্যবহার হয় শুধু অনির্দিষ্ট কর্তা বোঝায়। যেমন— লোকে বলে; বাঘে খায়; গোরুতে (কোন কোন উপভাষায় 'গোরুএ') দুধ দেয়; ঘোড়ায় (ঘোড়াতে) গাড়ী টানে। অনির্দিষ্ট কর্তা অর্থ এসেছে মূলের অনুক্ত কর্তা হতে। বঙ্গালী-কামরূপীতে [-এ] নির্দিষ্ট কর্তায়ও চলে। যেমন— রামে গিয়াছে (=রাম গিয়াছে) ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলায় কর্মকারকে বিভক্তি নেই। অর্থাৎ সংস্কৃতের [-ম] বিভক্তি ধ্বনি পরিবর্তন অংশে লুপ্ত হয়েছে। তাই কর্তা ও কর্ম এক-আকার। যেমন "গুরু পুচ্ছিঅ" (=গুরুকে পুছিয়া), "তান্তি বিকণঅ ডোম্বী" (=তাঁত বেচে ডোমনী)।

আধুনিক বাংলায় মুখ্য কর্ম অনির্দিষ্ট (indefinite), জড়-বস্তু (inanimate) অথবা জাতিবাচক (generic) হলে বিভক্তি-হীন হয়। যেমন— বাঘে মানুষ মারে, কামার লোহা গলায়, ইত্যাদি।"

আমাদের মনে রাখার বিষয় যে, প্রাচীন ও আধুনিক বাংলায় মুখ্যকর্ম কারকের বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বিভক্তি হয় না। আবার এদিকে অধিকরণ ও করণ কারকের বিভক্তি একরকম হওয়ায় অধিকরণের বিভক্তি করণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যেমন— সুখ দুঃখের দ্বারা [এখানে 'এর' 'দ্বারা' অর্থাৎ অধিকরণের বিভক্তি করণ কারকে ব্যবহৃত]

অধিকরণ ও সম্বন্ধ কারকের মধ্যে কিছু যোগ সাদৃশ্য দেখিয়েছেন সুকুমার সেন তা লক্ষ্য করার মত, বর্ণনাটা এই রকম— "সম্বন্ধের [-র] বিভক্তির সঙ্গেও অধিকরণের [-এ] বিভক্তির যোগ দেখা যায়। (গৌণ কর্মের [-রে] বিভক্তি দ্রষ্টব্য)।

যেমন- চন্দ্রে চন্দ্র কান্তিঃ যথা প্রতিভাসতে।
'এ' 'র' [বিভক্তি]

আবার এই ও অনুমান করা হয় বাংলার বিশিষ্ট সম্বন্ধ বিভক্তি [-র, -এর] এসেছে যথাক্রমে 'কর' (কার) ও 'কের' হতে। এই বিশেষণ স্থানীয় শব্দগুলি অপভ্রংশে কখনো কখনো মূল শব্দ হতে অসংলগ্ন থাকত, এবং সেই অসমাস প্রয়োগ হতে বাংলায় সম্বন্ধের [-কর, -কার, -কের] বিভক্তি এসেছে এইরূপ ধরা হয়। প্রাচীন বাংলায় সম্বন্ধপদ বিশেষণ ছিল বলে মনে করা হয়। যেমন— "কাহরি নাবেঁ" বা (কাহার নৌকায়) , "আপণ করি সখী" বা (আপনার সখী) ইত্যাদি।

অপাদান কারকের ক্ষেত্রে সুকুমার সেন বলেছেন— "বাংলায় অপাদান কারকের পদ নেই, তার বিশিষ্ট বিভক্তিও নেই। প্রাচীন বাংলায় দৈবাৎ অপভ্রষ্ট হতে আগত [-হুঁ (-হু)] বিভক্তি দেখা যায়। যেমন— খেপহুঁ (=ক্ষেপাৎ)। প্রাচীন বাংলায় এবং মধ্য বাংলায় কর্তা-কর্ম ছাড়া অন্য কারকের পদ অপাদান কারকের অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায়। যেমন— "কূলেঁ কূল" (=কূল হইতে কূলে)। আবার আধুনিক বাংলায় সম্বন্ধ পদের সঙ্গে অনুসর্গ যোগ

করে অপাদান কারকের অর্থ জ্ঞাপিত হয়। যেমন— "কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।"

কাল বা সময়ের দিক থেকে কারকের সংখ্যা ব্যবহারের নিয়ম অনুসারে কমছে। কারক সংখ্যা আগে যা ছিল তা বর্তমানের যুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাখা যায় না বলে অনেক ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, আবার কেউ কেউ পুরানো নিয়মের কাঠামোকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সুকুমার সেনের কারক ধারনার ক্ষেত্রে বোঝা যায় যে, তিনি প্রাচীন বাংলার কারকের সংখ্যা ঠিক রেখে বর্ণনা করেছেন। আসলে আমরা এই সময়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারব না যে, কোন ভাষাবিজ্ঞানী ব্যাকরণে কারকের সংখ্যা নিয়ে কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়েননি। আধুনিক কারকের বিভাজনের পাশাপাশি প্রাচীন-মধ্য বাংলার কর্তা-কর্ম-করণ-অপাদান-অধিকরণ ও সম্বন্ধ পদের বিভক্তি প্রয়োগের আলোচনা করেছেন। এবার আলোচনা করব সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর কারক-বিভক্তি।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম স্মরণীয় নাম হল সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। তার বিখ্যাত— 'The origin and development of the Bengali language' বইটি ভাষাবিজ্ঞানের জগতে খুব সাড়া ফেলে, তার পরে এই বইয়েরই বাংলা "ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ"[4]। তার এই 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' বইটিতে বাংলা কারক-বিভক্তি নিয়ে খুব সূক্ষ্ম ধারণা দিয়েছেন। তিনি আট রকম প্রকার কারকের কথা বলেছেন, যেমন- কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ এবং সম্বোধন। তিনি মূলত প্রাচীন বাংলা তথা সংস্কৃত কারকের সাত প্রকার নিয়মকে টোপকে আট প্রকারের কথা বলেছেন। এর আগে সুকুমার সেনের আলোচনায় আধুনিক বাংলার চার রকম কারকের কথা পেলাম। কিন্তু সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সেই রকম কোন আধুনিক বাংলা কারকের সংখ্যা কমানোর কথা বলেননি। তিনি প্রাচীন বা সংস্কৃত কারক নিয়মের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার সময়ে অনেক ভাষাবিজ্ঞানী কারকের সংখ্যা কমানোর অনেক নিয়ম দেখিয়েছেন। কিন্তু তিনি কারক-বিভক্তির সংখ্যা কমানো নিয়ে কোন মাথা ঘামায়নি। নিম্নে তার কারক ধারণার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হল—

তিনি বিভক্তি-কে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন— ১. শব্দ-বিভক্তি

[4]। ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ- সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

২. ক্রিয়া-বিভক্তি

১। শব্দ-বিভক্তি— শব্দ-বিভক্তি যুক্ত হলে, শব্দ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে পরিণত হয়। বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচন ও কারক বিভক্তি দ্বারা প্রকাশিত হয়। যেমন— ঘরে, বাড়ীতে, হাতে, আমায় ইত্যাদি।

২। ক্রিয়া-বিভক্তি— ক্রিয়া-বিভক্তি, ধাতুতে যুক্ত হয়ে, ক্রিয়া-পদের সৃষ্টি করে। ক্রিয়া-বিভক্তির একটি সংস্কৃত নাম তিঙ্, এই বিভক্ত্যন্ত ক্রিয়া-পদকে তিঙন্ত (তিঙ্+অন্ত) পদ বলে। ধাতুর উত্তর কাল-বাচক প্রত্যয়, ও তার উত্তর বিভক্তি এই সমস্ত মিলে ক্রিয়া-পদ হয়। যেমন— খা+ইব= খাইব, আবার খাইব এর সঙ্গে খাইব+এন= খাইবেন। বিভক্তির এই দুটো ভাগকে তিনি এই ভাবে দেখিয়েছেন।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর কারকের মূল বিষয় গুলো উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হল—

মোটামুটি সব ভাষাবিজ্ঞানী যে রকম কারকের সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি সেই রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। তা হল- "বাক্যে ক্রিয়া পদের সহিত বিশেষ্য অথবা সর্বনাম পদের যে বিশেষ সম্বন্ধ থাকে তাকে কারক (Case) বলে"। নিম্নে তিনি এই উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়েছেন—

"রাম কাগজে তুলি দিয়া ছবি আঁকিতেছেন— এই বাক্যে বিশেষ্য পদ চারটি— 'কাগজে', 'তুলি', 'ছবি'। 'আঁকিতেছে' পদটি ক্রিয়া, ক্রিয়ার সহিত বিশেষ্যগুলির সম্বন্ধ—

কে আঁকিতেছে?— রাম (ক্রিয়ার সহিত বিশেষ্যর কর্তা সম্বন্ধ) কর্তৃকারক।

কি আঁকিতেছে?— ছবি (ক্রিয়ার সহিত কর্ম সম্বন্ধ) কর্ম কারক।

কি উপায়ে বা কিসের দ্বারা?— তুলি (উপায় বা করণের সম্বন্ধ) করণ কারক।

কোন খানে বা কিসে?— কাগজে (ক্রিয়ার স্থান বা আধার বোঝাতে) অধিকরণ কারক।"

'কে', 'কি', 'কিসের দ্বারা', 'কোন খানে' এই সমস্ত প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা কর্তৃ, কর্ম, করণ, অধিকরণ কারক পাই।

বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত পদকে তিনি ইংরেজি ভাষা Post-postional word বলেন। ভাষার এগুলি পৃথক অবস্থান দেখা যায়। এগুলির অর্থ আছে, এবং অন্য পদের মত ভাষায় এগুলি স্বাধীন-পদ-রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কিন্তু বিশেষ্যের পরে আসে, বিশেষ্যকে কোনও বিশিষ্ট কারকে আনয়ন করে। বিশেষ্যের পরে আসে বলে, তাই এইরূপ পদকে ইংরেজিতে

Post-postional বলা হয়, বাংলায় এগুলিকে কর্ম প্রবচনীয়, সম্বন্ধীয়, পরসর্গ বা অনুসর্গ এই প্রকার নাম দেওয়া হয়। কিংবা এককথায় এদেরকে আমরা অনুসর্গমূলক কারক বলি। অনুসর্গমূলক কারক যথাক্রমে—

করণে— দিয়া, দ্বারা ইত্যাদি।

সম্প্রদানে— তরে, জন্য ইত্যাদি।

অপাদানে— হতে, থেকে, চেয়ে ইত্যাদি।

অধিকরণে— কাছে, নিকটে, মধ্যে ইত্যাদি।

তিনি প্রত্যেকটি কারকের একবচন ও বহুবচন শব্দের ব্যবহার দেখিয়েছেন- নিম্নে একটি কারকের ব্যবহার দেওয়া হল :

কারক	একবচন	বহুবচন
১। কর্তৃ বা কর্তা (প্রথমা বিভক্তি)	১। মূল শব্দ কোনও বিভক্তি যুক্ত হয় না। ২। -এ, -এতে, -য় ।	১। মূল শব্দ অপরিবর্তিত থাকে। ২। এরা, গুলাতে, গুলিতে ইত্যাদি।

কি প্রকারে বিভক্তি বা বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ বহু-বচনে ব্যবহৃত হবে, তা মূল শব্দটির প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে। কারক-বিভক্তির প্রয়োগে যেমন—

কর্তৃকারকের ক্ষেত্রে যেমন দেখাচ্ছেন- প্রবাদ বাক্যে ব্যবহার, সহযোগিতা-স্থলে ব্যবহার, সংখ্যা-বাচক শব্দ দ্বারা ব্যবহার। আবার কর্ম কারকের ক্ষেত্রে— প্রাণী-বাচক শব্দ ও অপ্রাণী-বাচক শব্দ এবং কবিতায় কর্মপদের ব্যবহার দেখিয়েছেন। এই রকম প্রত্যেকটি কারকের ক্ষেত্রে কোথায় কি প্রয়োগ দেখানো সম্ভব, তাই তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

তাই পরিশেষে বলতে পারি যে, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় কারক-বিভক্তি সাধারণ ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। তিনি সহজ সরল ভাষায় একটা বিস্তৃত এলাকা নিয়ে কারক-বিভক্তি-কে বিশ্লেষণ করছেন। তাই তার কারক-বিভক্তি নিয়ে নতুন করে কিছু বলার থাকে না। মোটামুটি যেসব বিষয় বলবার প্রয়োজন মনে করেছি তা সংক্ষিপ্ত ভাষায় উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। বাংলার সব ভাষাবিজ্ঞানী কারক-বিভক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন,

কিন্তু তাদের সকলের মতাদর্শ ভিন্ন ভিন্ন। এবার আলোচনা করব কৃষ্ণপদ গোস্বামী কারক-বিভক্তি।

কৃষ্ণপদ গোস্বামী

কৃষ্ণপদ গোস্বামীর কারক ধারণা সম্পর্কে বলা যায়, তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের নিয়মকে অনুসরণ করে বাংলা কারকের বিভাজন করছেন। তিনি সুনির্দিষ্ট ভাবে বলেননি যে, বাংলা কারক পাঁচটি হওয়া প্রয়োজন, এর বাইরে কোন কারকের ব্যবহার এখন লক্ষ্য করা যায় কি? এই রকম কোন যুক্তি তর্কের মধ্যে তিনি যাননি। তিনি এই বিষয়ে কোন দ্বিমত পোষণ করেননি। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে কারকের বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রাচীন-মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা কারকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। তার আলোচনার বক্তব্য এই রকম—

"সংস্কৃতের আটটি বিভক্তি আর প্রাকৃত স্তরে চার-পাঁচটি আছে বলে মনে করা হয়। তিনি বলছেন— চতুর্থী ও পঞ্চমী বিভক্তি অনেকস্থলে এক হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় কারক ছয়টি— কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ ও সম্বন্ধ। আধুনিক বাংলায় কর্তা, কর্ম, করণ, অধিকরণ ও সম্বন্ধ এই নিয়ে পাঁচটি কারকের অস্তিত্ব মেলে। শব্দের সঙ্গে অনুসর্গ (post-position) যোগ করে অন্যান্য কারকের অর্থ প্রকাশ করে। আবার বাংলায় –এ, -কে, -রে, -র, -এর, -তে, -এতে এই কয়েকটি বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় বলে তিনি মনে করেন। তার মধ্যে একমাত্র "এ" বিভক্তি সংস্কৃত তৃতীয়ার একবচন "এন" হতে এসেছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার কারক মাত্র দুটি— কর্তৃকারক বা মুখ্যকারক (Nominative) এবং তির্যক বা গৌণকারক (Oblique)। কর্তৃকারকের মধ্যে পড়ে— প্রথমা ও তৃতীয়া বিভক্তি। ষষ্ঠী ও সপ্তমী এবং অনুসর্গ-জাত বিভক্তিগুলি গৌণকারকের মধ্যে পড়ে।"

কর্তৃকারক— "প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় প্রথমার একবচনে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ যথেষ্ট মেলে। যেমন— প্রাচীন বাংলায় চর্চাপদে, কুম্ভীরে খাই।

'এ' [বিভক্তি]

মধ্য বাংলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পদে— না ছাড়ে নান্দের পোএ।

'এ' [বিভক্তি]

আধুনিক বাংলায় অনির্দিষ্ট কর্তা বোঝাতে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ হয়।

যেমন— লোকে বলে। ['এ' বিভক্তি]''।

এই রকম প্রতিটি কারকের ক্ষেত্রে –এ, -কে, -রে, -র, -এর, -তে, -এতে বিভক্তির প্রয়োগ উপর ভিত্তি করে প্রাচীন-মধ্য ও আধুনিক বাংলার কারক-বিভক্তি কে আলোচনা করেছেন। তার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বোঝা যায় যে তিনি বিভক্তির প্রয়োগ-কে গুরুত্ব দিয়েছেন। এবার ভাষাবিজ্ঞানী পরেশ চন্দ্র মজুমদারের আলোচনা।

পরেশ চন্দ্র মজুমদার

পরেশ চন্দ্র মজুমদার ভাষাবিজ্ঞানের জগতে অন্যতম নাম। তার বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম বই হল— 'বাঙলা ভাষা পরিক্রমা'। এই বইয়ে সাধারণত বাংলা ব্যাকরণ ইতিহাসের ধাপ গুলোর একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা দিয়েছেন। তিনি মোটামুটি ব্যাকরণের প্রায় সব বিষয় নিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। তার এই বইয়ে তিনি কারক ও অনুসর্গ (Case and post- position) একটা সূক্ষ্ম ধারণা দিয়েছেন। তার এই কারক ধারণা নিম্নে বর্ণনা করা হল—

আর অন্য ভাষাবিজ্ঞানীর মত তিনি ও প্রাচীন বাংলা থেকেই সংস্কৃত সাতটি কারকের ব্যবহারের প্রচলিত দেখিয়েছেন, যথা— কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান/গৌণকর্ম, অপাদান, অধিকরণ কারক এবং সম্বন্ধ। তিনি কোন কারকের সংখ্যা নিয়ে যুক্তি তর্কের মধ্যে যাননি। তিনি গঠন-প্রকৃতির দিক দিয়ে কারকের তিনটি ভাগের কথা এর আগে আলোচনা করেছেন তা হল ১। মুখ্যকারক ২। অনুক্ত বা গৌণকারক বা তির্যক কারক ৩। সম্বন্ধপদ। মোটামুটি প্রায় ভাষাবিজ্ঞানী এই তিনটি ভাগের এই আলোচনা করেছেন। এছাড়াও প্রাচীন ও মধ্যবাংলার বিভক্তি গুলির বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ও মধ্যবাংলার বিভক্তি গুলির বিকাশ ঘটেছিলো তার ক্রম অনুসরণ যেমন- অপভ্রংশ-অবহটঠ বিভক্তির সংরক্ষণ, তদ্ভব বা বিবর্তিত বিভক্তি, শূন্যবিভক্তির, অনুসর্গীয় বিভক্তির উল্লেখ করেছেন। নিম্নে যে কোন একটি বিভক্তি গুলির উল্লেখ দেখানো হল—

শূন্যবিভক্তি (Zero- ending)— ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে প্রাচীন তথা মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার বিভক্তিগুলি ক্রমশ লুপ্ত হতে থাকে। পদান্ত অক্ষরে শ্বাসাঘাতের (Stress) অভাবই এর কারণ। শূন্য বিভক্তির উদাহরণ চর্চাপদের প্রতিটি কারকেই (গৌণ কর্ম

বাদে) পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলায় তো বিভক্তিহীনতা একটি বিশেষ লক্ষণ। যেমন— বৃষ্টি নামল, ফুটবল খেলে, কাল এসো, বাড়ী যাও ইত্যাদি।

এই রকম শূন্য বিভক্তির ঐতিহাসিক বিবর্তনের মত অপভ্রংশ-অবহটঠ বিভক্তির সংরক্ষণ, তদ্ভব বা বিবর্তিত বিভক্তি, অনুসর্গীয় বিভক্তির আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি কারকের বিবর্তিত রূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আধুনিক কারক-বিভক্তি আলোচনা করতে গেলে এই সমস্ত বিবর্তিত রূপ অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। তার এই আলোচনা থেকে একটা সুস্পষ্ট প্রাচীন-মধ্য ও আধুনিক যুগের কারক-বিভক্তির ধারণা পাওয়া যায়। এবার আলোচনা করব শ্রী বিজন বিহারী ভট্টাচার্য এর কারক-বিভক্তি।

বিজন বিহারী ভট্টাচার্য

বাংলা ব্যাকরণের কারক-বিভক্তি আলোচনা যুক্তিতত্ত্বের দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন বিজন বিহারী ভট্টাচার্য। বাংলা ব্যাকরণে কোন না কোন বিষয় নিয়ে বোঝা পড়া করতে গেলে কোন না কোন প্রশ্ন আসেই; তা আমরা ভালো করে জানি। এখানে কারক-বিভক্তির আলোচনা করতে গিয়ে বিজন বিহারী ভট্টাচার্য কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন।

তিনি বলেছেন, কারক-বিভক্তি সমস্যা বাংলা ব্যাকরণের একটি প্রধান সমস্যা। সমস্যাটা কোথায় তা পরিস্ফুট করবার জন্য কারক-বিভক্তি বিষয়ক প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্ন গুলো এই রকম—

(ক) কর্মকারকে কখন সপ্তমী এবং অধিকরণ কারকে কখন পঞ্চমী বিভক্তি হয়? নিম্নে উল্লেখ কর?

(খ) কর্তৃকারকে কোন কোন স্থলে ষষ্ঠী এবং কোন কোন স্থলে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয়?

(গ) প্রথমা বিভক্তি কোন কোন কারকে হতে পারে? কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া এবং করণ কারকে হতে পারে কি না?

বিজন বিহারী ভট্টাচার্য কারকের বক্তব্যটা এই রকম—

“প্রাচীন বাংলা তথা সংস্কৃত নিয়মে কর্তৃ হতে অধিকরণ পর্যন্ত সাতটি কারক রয়েছে। সম্বন্ধ ক্রিয়ার সহিত অন্বিত নয় বলে তার নাম পদ, কারক নয়। আবার তিনি বলেছেন, অধিকরণ কারকে ‘এ’ বিভক্তি হয় এবং ‘এ’ হল সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন, তা হলে ততটা

গোলমাল হবার কথা নয়, কিন্তু কথাটি হল এইরকম যদি বলি— 'হাতে মাথা কাটি' এই বাক্যে 'হাতে' শব্দের কারক হল করণ এবং বিভক্তি হল সপ্তমী, তা হলে সেই টানটা সহিবে কি? সহা উচিত কি? তার এই যুক্তি তর্ক বিষয় গুলো কারক আলোচনার ক্ষেত্রে অবশ্যই দরকার। তিনি মূলত ব্যাকরণবিদদের উদ্দেশ্যে এই রকম প্রশ্ন করেছেন। তার যে কোন একটা প্রশ্নের মীমাংসা এখানে দেওয়া হল—

(গ) নং প্রশ্নের উত্তরটি এই রকম— আমরা মূলত প্রথমা বিভক্তি-কে শূন্য বিভক্তি বলে থাকি। সাধারণত কারক-বিভক্তির ক্রম অনুসারে কর্তৃকারকে আমরা প্রথমা বিভক্তি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু কর্তৃকারক ছাড়াও অন্য কারকে দেখা যায়।

যেমন-

১। কর্তৃকারক— তুমি আমাকে কলমটা সেদিন দিয়েছিলে। [কলমটা এই কারকের বিভক্তি, এই কলমে কোন বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হয়নি, তাই এটা প্রথমা বিভক্তি বা শূন্য বিভক্তি।]

২। অধিকরণ কারক— দাদা বাড়ি আছে কি? [এই কারকের 'বাড়ি' বিভক্তি, বাড়ির সঙ্গে বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হয়নি, তাই অধিকরণ কারকে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি হয়।]

৩। কর্মকারক— কর্মবাচ্যে কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা— আমা কর্তৃক 'চন্দ্র' দৃষ্ট হয়।

৪। করণ কারকে প্রথমা বিভক্তি বা শূন্য বিভক্তি হয় কিনা? উত্তর হল— হয়।
যেমন— তারা ফুটবল খেলছে [ফুটবলের দ্বারা খেলছে], এক্ষেত্রে 'ফুটবলের' কোন বিভক্তি যোগ হয়নি। তাই করণ কারকে প্রথমা বিভক্তি হয়।

৫। কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি— আমাকে ডাকবে ['কে' হল দ্বিতীয়ার বিভক্তির চিহ্ন, তাই কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।]

বিজন বিহারী ভট্টাচার্য কারক-বিভক্তি আলোচনায় রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর উক্তিগুলো গ্রহণযোগ্যে বলে মনে করছেন। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর উক্তি গুলি হল- "দান ক্রিয়ার জন্য বাংলায় একটা পৃথক করে কারকে রাখতে রাজি নই।" তিনটির বেশি কারক রাখার দরকার নেই। যেমন— কর্তা, কর্ম, ও আর একটি তৃতীয় কারক যা বিভক্তি চিহ্ন 'এ' এবং 'তে'। এই তিনটি কারকে বাংলা ভাষার কাজ চলে যাবে।"

কারক হ্রাসের প্রস্তাব আজও শোনা যায়। প্রস্তাব এই রূপ যে, উচ্চতর পণ্ডিত মহলে শব্দতাত্ত্বিক আলোচনায় সীমা অতিক্রম করতে পারি নি। সেদিন যেমন ছিল এখন তেমন আছে। কেউ কেউ কারক সংখ্যা কমিয়েছেন আবার কেউ কেউ অপরিবর্তিত রেখে দিয়েছেন। এবার ভাষাবিজ্ঞানী প্রবাল দাশগুপ্ত কারক-বিভক্তি আলোচনা করব।

প্রবাল দাশগুপ্ত

প্রবাল দাশগুপ্ত তার "কথার ক্রিয়াকর্ম"[5] বইয়ে 'কারক : দুঃস্বপ্নের আসান' প্রবন্ধধর্মী একটা আলোচনা করেন। তার এই 'কারক : দুঃস্বপ্নের আসান' প্রবন্ধটি থেকে একটা আধুনিক কারক ধারণা পাওয়া যায়। বাংলা কারক সম্পর্কে আমাদের সকলের একটু ভীত মনোভাব রয়েছে। তাই সকল ভাষাবিজ্ঞানী এই ভীত মনভাবকে অল্প অল্প করে দূর করার চেষ্টা করেছেন। প্রবাল দাশগুপ্তের এই প্রবন্ধ'র নাম থেকে বোঝা যায় যে, তিনি কারকের দুঃস্বপ্নের একটা অবসান ঘটাতে চান। এবার তার কারক-বিভক্তি ধারণার সংক্ষিপ্ত বিষয় আলোচনা করব—

"বিদ্যালয়ে যে বাংলা ব্যাকরণ পড়াতে হয় সে ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্নের হাত থেকে বাঁচবার একটাই উপায় আছে। সে হল জেগে ওঠা। সাধারণত গতানুগতিক ব্যাকরণে বই বাংলার যে সব জিনিস নিয়ে কথা বলে না, ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতিতে সেগুলোর বিশ্লেষণ সম্ভব, এবং সেই রকম বিশ্লেষণ করলে নতুন স্পষ্টতা পাওয়া যায়, এ কথা এখন অনেকেই জানেন। একেকটা সমস্যা তুলে ধরে নতুন নতুন প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। ইস্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের বইয়ে যে সব দিকের কথা বলা আছে সেগুলোর ঠিক মত আলোচনা নেই, সেগুলোর বেলাতেও যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতা আনতে পারে, এটা দেখাবার জন্য এই নিবন্ধে এমন এক বিষয় বেছে নেওয়া হয়েছে বা ইস্কুল পাঠ্য ব্যাকরণের অন্যতম বিভীষিকা- বিশেষ্যের বিভক্তি কারক, আর কেস।"

অর্থাৎ ওনার এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের ইস্কুল পাঠ্যে সকলের কম বেশি ব্যাকরণগত সমস্যা রয়েছে। আর ব্যাকরণের অন্যতম সমস্যা হল কারক বিভক্তি সমস্যা। তাই প্রবাল দাশগুপ্ত কারকের প্রবন্ধে 'বিভীষিকা' কথাটি উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলছেন " সংস্কৃতের ঐতিহ্য কর্তৃকারক আর কর্মকারকের সঙ্গে পশ্চিমী ঐতিহ্য কোন ধারণার সমীকরণ হয় না। পশ্চিমী ব্যাকরণ চিন্তায় কারক বলে কিছু নেই। তার

[5]। কথার ক্রিয়াকর্ম- প্রবাল দাশগুপ্ত

বদলে ওদের আছে ‘সাবজেক্ট’ আর ‘অবজেক্ট’। এগুলো কারক নয়; এগুলোকে অরা আজকাল বলে ‘গ্র্যাম্যাটিকাল ফাংশন’। এই প্রয়োগে ‘গ্র্যাম্যাটিকাল ফাংশন’ কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবে ‘ধেয়’ চলতে পারে। এখানে অবজেক্ট- এর প্রতিশব্দ হিসেবে ‘অবধেয়’ আর সাবজেক্ট এর প্রতিশব্দ হিসেবে ‘অভিধেয়’ ব্যবহার করেছেন। মনে রাখার জন্য এই নিয়মকে তিনি ব্যবহার করেন।”

এবার এই দুইটির বর্ণনা এমন- “ কারক আর ধেয় একই জিনিস নয়, কর্তা মানে অভিধেয়, আর কর্ম মানে অবধেয়। কর্তা ও কর্মের সঙ্গে অভিধেয় বা অবধেয়র সরাসরি তুলনা করা অসংগত। এর তফাতটা স্পষ্ট হয় দুটো ইংরেজি বাক্যের কথা ভাবলে—

১। The ambassador (কর্তা এবং অভিধেয়) has withdrawn those statements।

২। Those statements (অভিধেয়) have been withdrawn by the ambassador (কর্তা)।

দুটো বাক্যেই প্রত্যাহারকারী হলেন কর্তা ‘রাষ্ট্রদূত’। কর্তা নিজেই প্রত্যাহার করছেন। বিভক্তি শব্দটার সংকীর্ণ প্রয়োগও আছে, ব্যাপক প্রয়োগও আছে। কারক-বিভক্তির প্রয়োগ।”

এবার প্রবাল দাশগুপ্তের ‘অবধেয়’ ও ‘অভিধেয়’ এর ধারণা একটু উদ্ধৃতি করে দেখাব-

“ ১। রাহুল উচ্ছে অপছন্দ করতেন।

প্রতিফলণের এজাহার বলেছে ‘রাহুল’-ই একমাত্র অভিধেয়। অথচ ‘রাহুল’ আর ‘উচ্ছে দুটোই বিভক্তিহীন অর্থাৎ বিভক্তিহীনতার জোরেই অভিধেয় হওয়া যায় এটা তাহলে ঠিক নয়।

২। আমরা জন্মদিনে ওকে রেকর্ড দেবো।

এখানে অবধেয় কি ‘ওকে’ না রেকর্ড না দুটোই? পশ্চিমী ঐতিহ্য বলে দুটোই, ‘ওকে’ গৌণ (ইনডিরেক্ট বা indirect) অবধেয়, ‘রেকর্ড’ মুখ্য (ডিরেক্ট) অবধেয়। এরকম বলার কোন বৈধ যুক্তি জানি না। এখানে তিনি নতুন পরিভাষা এবং নতুন ধারণা তন্ত্র তৈরি করার কথা বলছেন। যে ধেয়র কথা আলোচনা হচ্ছে তার সদস্য সংখ্যা হল পাঁচ—

অভিধেয়	বিভক্তি : শূন্য
অবধেয়	?

প্রতিধেয়	- কে
উদ্ধেয়	- এর
অনুধেয়	- এ –তে

বাংলায় বিভক্তি মোট এই কটাই আছে ('থেকে, 'জন্য', ইত্যাদি বিভক্তি নয়, অনুসর্গ)। অবধেয়র ভাগ্যে নতুন কেউ জুটবে না। অন্য কোন ধেয়র সঙ্গে তাকে বিভক্তি ভাগ করে নিতেই হবে"। [একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে, কারক বদলাচ্ছে না, বদলাচ্ছে কেবল ধেয়র বিশ্লেষণ]।

সাধারণত আমরা জানি দ্বিতীয়া বিভক্তির যে চিহ্ন তা চতুর্থী বিভক্তির ক্ষেত্রেই একই চিহ্ন, আর এই চতুর্থী বিভক্তি মানে সম্প্রদান কারক তাই তিনি সম্প্রদান কারকে গৌণ কারক হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব রাখেন। আধুনিক সময়ে কারকের আলোচনায়, সম্প্রদান কারক নিয়ে রাখার না রাখার একটা প্রস্তাব চলে। কারণ কারক সংখ্যা অযথা বাড়িয়ে লাভ নেই, একটি কারক দিয়ে যদি দুই রকম কাজ চলে তাহলেই যথেষ্ট। কিন্তু প্রবাল দাশগুপ্ত বেশ একটা যুক্তির সঙ্গে সম্প্রদান কারকের এক অবস্থানের কথা বলেছেন- তার সম্প্রদান কারক সম্পর্কে সর্বশেষ কথায় বলতে পারি, প্রাচীন আর্যশব্দ রূপে সম্প্রদান কারকের আলাদা করে যেটুকু স্পষ্ট স্বীকৃতি ছিল, মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার তা আর রইল না বা থাকল না। কিন্তু অনেক ভাষাবিজ্ঞানী সম্প্রদান কারক হিসেবে ধরে আলোচনা করেছেন। তাই পরিশেষে বলতে পারি, প্রবাল দাশগুপ্ত কারকের সঙ্গে ক্রিয়ার কর্মের ব্যবহারের একটা জট পাকানো দ্বন্দ্বকে নির্মূল করার চেষ্টা করছেন। এবার ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকারের কারক-বিভক্তি নিয়ে আলোচনা করব।

পবিত্র সরকার

আজ এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা প্রবাল দাশগুপ্ত ও পবিত্র সরকার এর মত ভাষাবিজ্ঞানী দের কারক-বিভক্তি নিয়ে নতুন করে কাজ করার চিন্তা ভাবনা দেখতে পাই। পবিত্র সরকার তার "বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গে"[6] বইয়ে আধুনিক কারক নিয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। এবার পবিত্র সরকারের কারক-বিভক্তি আলোচনার মূল বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব—

[6]। বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গে- পবিত্র সরকার

এখনো স্কুল-পাঠ্যে কারক-বিভক্তির গোলযোগ আছে বলে ধারণা? কেননা এখনকার সময়ে শিক্ষকদের কারক-বিভক্তি পড়ানোর রুচি নেই বলেলেই চলে, পড়ানোর অনিচ্ছা ইত্যাদি। পড়ানোর বিষয়ে যদি সঠিক বা স্পষ্ট ধারণা না থাকে তাহলে পড়ানোর অনিচ্ছা থাকবেই। পবিত্র সরকারের ধারণার সাথে আমারও একমত। কেননা কোন বিষয়ে ভালো না জানলে পড়ানোর অনিচ্ছা থাকবেই।

"আসলে এই সব ধারণার বিভ্রান্তির উৎস একাধিক। প্রথম উৎস সংস্কৃত কারক-বিভক্তি প্রকরনের মৌলিক গণ্ডগোল, যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ' বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে (১৩০৮) খুব সুন্দর করে বোঝানো আছে- "কারক অর্থ-সাপেক্ষ, বিভক্তি শব্দ সাপেক্ষ! সংস্কৃতে অনেকগুলি বিভক্তি আছে, অনেকগুলি কারক আছে, কারক ভিন্ন নানা সম্বন্ধে নানা কারণে নানা বিভক্তির উৎপত্তি হয়।" এই কথাগুলির তিনটি ইঙ্গিত দেখিয়েছেন পবিত্র সরকার-

১। কারক থাকলেই বিভক্তি থাকবে এমন নাও হতে পারে।

২। বিভক্তি থাকলেই তা কারকের বিভক্তি হবে তার কোন অর্থ নেই।

৩। একই কারকের যে একই বা এক ধরনের বিভক্তি হবে তাও বলা সম্ভব নয়।

কারকের ক্ষেত্রে এই যুক্তিগুলো অবশ্য ঠিক বলে আমি মনে করি। তিনি ছয় রকম কারকের পাশাপাশি দুটি পদ সম্পর্কে বলছেন—

'সম্বন্ধ' আর 'সম্বোধন'। আর এই দুটি পদ সম্পর্কে তিনি বলছেন- "সংস্কৃত মতে পদ কারক নয়, কারণ পদের বেলায় ক্রিয়ার সঙ্গে শব্দটির কোনো সম্বন্ধ ঘটছে না, সম্বন্ধ ঘটছে শুধু বিশেষ্য বা সর্বনামের সঙ্গে। যেমন— 'আমার বই'— এতে সর্বনাম 'আমি' আর বিশেষ্য 'বই' যুক্ত হচ্ছে, এখানে ক্রিয়ার কোন প্রসঙ্গ নেই। সম্বোধনে আবার সম্বোধন শব্দটি যেন বাক্যের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে, মূল বাক্যের সঙ্গে কোনোভাবে অন্বিত হয় না। ফলে এগুলি পদ, কারক নয়। তবে 'পদ' কথাটির এখানে পারিভাষিক অর্থ আলাদা। বাক্য ব্যবহৃত শব্দ মাত্রেই পদ– এটি সেই 'পদ' নয়। এখানে কারক বনাম পদ; আর ওখানে শব্দ বনাম পদ, ইউরোপীয় মতে সবই 'কেস', (Case) , কারণ সেখানে 'কেস মূলত' শব্দের প্রকট রূপ নির্ভর- তা বাক্যে ব্যবহৃত 'নাউনের কন্‌ডিশান' সূচক। অর্থাৎ বাক্যে ব্যবহৃত হতে গেলে বিশেষ্য বা সর্বনাম যে অন্যরকম একটু চেহারা নেয়- সেই চেহারার চিহ্ন হল কেস।"

তবে সংস্কৃতে ও কারকের চিহ্ন যেমন বিভক্তি (সংখ্যাকারক-বোধয়িত্রী বিভক্তিঃ) ইউরোপীয় কেস— এর চিহ্নও তাই, যার ইংরেজি নাম ending বা suffix । অর্থাৎ ওনার এই আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ দুটি কারক নয়, আবার পদও নয়, যাকে বলা হচ্ছে 'কারক বনাম পদ'।

"অর্থের দিক দিয়ে কারক চিনতে হলে তার সঙ্গে কোনো প্রকাশ্য চিহ্ন যদি না পাই— ব্যাকরণ রূপতত্ত্ব বা 'মরফোলজি' অংশে তার আলোচনা করা মুশকিল। আর অর্থের কোন শেষ নেই। যেমন— 'সে বাড়ি আছে'-তে 'বাড়ি' এক কারক হতে পারে, কারণ 'বাড়ি' ক্রিয়ার আধার, কিন্তু 'সে বাড়ি যাচ্ছে'-তে 'বাড়ি' অন্য কারক হতে পারে, কারণ সেটি ক্রিয়ার 'লক্ষ্য'। অর্থ-অনুযায়ী কারক-পরিকল্পনা করতে গেলে হয়তো ডজন-ডজন 'কারক' তৈরি হবে।"

এই মতের পরিপ্রেক্ষিত বলা যায়, এই নব্য কারক তত্ত্ব এই মুহূর্তে বাংলা কারক-বিভক্তির আলোচনায় খুব প্রাসঙ্গিক নয়, স্কুল পাঠ্য ব্যাকরণের কারক তত্ত্বে তো নয়ই। কিন্তু একটা জিনিস ফিলমোরের বিবেচনা থেকে বুঝতে পারি যে, শুধু অর্থের উপর কারক-বিভাগ করতে গেলে শুধু দুটো বা আটটা কেন, অসংখ্যা ভাগ তৈরি করা যায়। তাই কারকে যে-কটা অর্থগত ভাগ আমাদের ব্যাকরণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দেয় সেই কটাকেই বাংলায় কারক বলে গণ্য করব।

আবার তিনি, বিভক্তি প্রধান কারক-কে সবল (strong) কারক এবং অনুসর্গ মূলক কারককে দুর্বল (weak) কারক বলে চিহ্নত করেছেন। কারণ 'সবল কারক' হল তার প্রধান ভাবে স্বীকৃত রূপ। আর দুর্বল রূপ হল তার গৌণ রূপ। আর অনুসর্গ-প্রধান কারক হল দুর্বল রূপ সে কারকের প্রধান রূপ নয়। যেমন— ১। তোমার বই ['র' বিভক্তি সম্বন্ধ পদ]— এটি কারকের স্বীকৃত রূপ। ২। তোমার জন্য এ বইটা এনেছি। ['জন্য' হল অনুসর্গ মূলক বিভক্তি]— এখানে 'জন্য' ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে 'তোমার জন্য' হিসাবে ব্যবহৃত হল। বাক্যকে বোঝাবার জন্য এখানে সহায়ক হিসেবে অনুসর্গ মূলক কারক ব্যবহার হয়েছে। তার এই কারকের সবল রূপ ও দুর্বল রূপের ধারণাটা বেশ ভালো।

পবিত্র সরকারের এই কারক-বিভক্তি ধারণা আজকাল ব্যাকরণ বিদ্যার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্ব পূর্ণ বলে আমি মনে করি। তিনি কারকের জটিলতাকে দূর করার চেষ্টা করেছেন। তার এই কারকের অংশ থেকে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

অতএব, বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানীর যে আলোচনা করলাম তাতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বাংলা কারক-বিভক্তি বিদ্যা আজ থেকে শেখা হচ্ছে না, বহুবছর আগে থেকে এগুলোর চর্চা চলছিল। তাই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একেক জনের একেক রকম ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। তাই উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা কারক-বিভক্তির একটা ধারণা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

THE CATEGORY OF BANGLA CASE (বাংলা কারকের শ্রেণীবিভাগ) —

প্রথমে যদি বলা হয় বাংলা কারকের শ্রেণী বিভাগ কর? তাহলে প্রশ্ন আসে আমরা কি হিসাবে এই শ্রেণী বিভাগ করব? এই শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে— দু-একটি কথা বলার আছে। লক্ষ্য করতে হবে যে এই শ্রেণী বিভাগে একাধিক মাত্রা বা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে, শুধু মাত্র একটি মাত্র মাপকাঠি থেকে শ্রেণী বিভাগ করা হয়নি।

তাই বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর মত একটু পোষণ করা হয়েছে এই শ্রেণী বিভাগের ক্ষেত্রে। তাই বলতে পারি শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে যার প্রথম শ্রেণীর— দুটি প্রধান উপশ্রেণী- ১. সংযোগবাচক ও ২. সম্বন্ধবাচক— মূলত বাক্যের অন্বয়ে ওই শব্দগুলির কি ভূমিকা তার উপর নির্মিত, অর্থাৎ এটি একটি অন্বয়গত বা Syntactic শ্রেণীবিভাগ। দুটিই শব্দ বা বাক্যকে অন্য বাক্য বা শব্দের সঙ্গে জুড়ে দেয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীটি শব্দগুলির অর্থের উপর নির্ভর করে কল্পনা, ফলে এটি একটি শব্দার্থগত অর্থাৎ Semantic শ্রেণীবিভাগ।

আবার এই প্রশ্ন মনে হয় যে, সংস্কৃত বিভক্তি প্রধান বা inflectional ভাষা, বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা, অন্তত বিশেষ্য-প্রকরণে কারকের ক্ষেত্রে সেরকম বিভক্তি প্রধান ভাষা নয়। তা অনেকটাই বিশ্লেষণধর্মী বা analytical অর্থাৎ বিভক্তির বদলে বা নতুন বিভক্তির সঙ্গে পৃথক শব্দ দিয়েই এ ভাষায় বিভক্তির কাজ সম্পূর্ণ হয়, সেক্ষেত্রে একটি উদাহরণ যেমন— "সংস্কৃতে বলা হয়— 'পুত্রাৎ' বাংলায় বলা হচ্ছে 'পুত্রের কাছে' বা 'পুত্র থেকে' ইত্যাদি। সংস্কৃতের সাত কারকের সাত বিভক্তি, প্রতিটি বিভক্তির (প্রথমা, দ্বিতীয়া ইত্যাদির) আবার তিন বচনের রূপ ধরলে ৭*৩ হয় বা ২১ টি বিভক্তি হতে পারত কারণ (সর্বনাম ও বিশেষণ রূপটা এখানে বিশেষ্যের মতো কাজ করে)।"[7] কিন্তু এটা শুধু ভাবনা তা ব্যাকরণের ভাষায় কখনো হওয়ার নয়। এইও দেখব একই বিভক্তি একাধিক কারকে ও বচনে ব্যবহৃত হয়।

[7] । বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ- পবিত্র সরকার [২০০৬ : ১২৭]

রূপের দিক থেকে বাংলা কারকগুলিকে বিভক্তি-প্রধান কারক এবং অনুসর্গ-প্রধান কারক এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। আমরা অন্যত্র তাই করেছি। আর একটি শ্রেণী হতে পারে শব্দবিন্যাস-প্রধান। কিন্তু এটাও আমাদের মনে হতে পারে যে, বিভক্তি-প্রধান ও অনুসর্গ-প্রধান কারকের শ্রেণী বিভাগটি কি প্রাচীন বাংলা থেকে ছিল নাকি এটা আধুনিক সময়ের ধারণা? এই নিয়ে একটু সংশয় থেকেই যায় মনে।

আমরা জানি, প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের মৌখিক ভাষা হল প্রাকৃত। আর এই প্রাকৃতে এসে উপসর্গের স্থান গ্রহণ করলো কর্মপ্রবচনীয় বা অনুসর্গস্থানীয় বিভিন্ন পদ। বিভিন্ন বিভক্তির ক্রমিক অবক্ষয়ের ফলে কারকের অর্থ ঠিক রাখতে নামবাচক (Nominal) বা ভাববাচক (verbal) অনুসর্গ-পদের সাহায্য ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। প্রাকৃতের প্রাচীনতম স্তরে ভাববাচক অনুসর্গের প্রয়োগ ছিল দুর্লভ, অর্বাচীন স্তরে তা ব্যবহৃত হতে শুরু হতে করলো। এগুলি ছিল মূলত কৃদন্ত বা ল্যবর্থ প্রত্যয় জাতীয়। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় প্রত্যয়ের ব্যবহার আধুনিক ভাষাতে এসে বাড়তে থাকে।

নবীন ভারতীয় আর্যভাষা গুলি উপরোক্ত প্রাকৃত ধারাকেই অনুসরণ করেছে। আধুনিক ভাষাগুলির অনুসর্গ অবশ্য বিভিন্ন উৎস থেকে এসেছে। এদের সাধারণ স্বরূপ হল—

১। অনুসর্গীয় প্রত্যয় (Postposition affix)— মূলত নামবাচক অনুসর্গ হলেও বিবর্তন অবক্ষয়ের ফলে এগুলি প্রত্যয়-বিভক্তিতে পরিণত হয়েছে।

২। নাম বাচক অনুসর্গ (Verbal postposition) — অর্থাৎ অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ। বাংলায় এদের বিভাগ হল: তদ্ভব, তৎসম, অর্ধতৎসম ও বিদেশী ইত্যাদি।

৩। ভাব বাচক অনুসর্গ (Verbal postposition)— অর্থাৎ মূলত ক্রিয়াজাত পদ, ব্যবহারও অসমাপিকা ক্রিয়ার মতো।

এবার প্রথমে আমরা প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগের বাংলা কারক কত রকম ধরা হয় তা নিয়ে কথা বলব এবং তার পর শ্রেণী বিভাগের আলোচনায় আসবো। বিভক্তি অনুসারে প্রাচীন-মধ্য বাংলা ও সংস্কৃত কারকে আমরা সাত রকম কারক দেখতে পাই।

কারক

কর্তৃ কর্ম করণ সম্প্রদান অপাদান অধিকরণ সম্বন্ধপদ

আবার অনেক সময় সম্বোধন পদ নিয়ে প্রাচীন-মধ্য বাংলাতে ও সংস্কৃতের অনুরূপ আটটি কারক ধরা হয়ে থাকে।

কারক

কর্তৃ কর্ম করণ সম্প্রদান অপাদান সম্বন্ধপদ অধিকরণ সম্বোধনপদ

এই রকম প্রাচীন ভারতীয় আর্যে কারক ছিল আটটি। অবশ্য, সম্বোধন এবং সম্বন্ধের ক্রিয়ার সঙ্গে কোন যোগ নেই বলে ব্যাকরণবিদরা ছয় প্রকার কারক বলে থাকেন।

কারক

কর্তৃ কর্ম করণ সম্প্রদান অপাদান অধিকরণ

ভাষাবিজ্ঞানী Miriam Butt ও তার 'Theories of case'[8] বইয়ে Indian tradition case এ সংস্কৃত কারকের সাতটি ভাগের কথা বলেছেন—

1. Nominative Case (কর্তৃকারক)
2. Accusative ,, (কর্মকারক)
3. Instrumental ,, (করণকারক)
4. Dative ,, (সম্প্রদান কারক)
5. Ablative ,, (অপাদান কারক)
6. Genitive ,, (সম্বন্ধপদ)

[8] . Theories of case- Miriam Butt [2006 : 16]

7. Locative ,, (অধিকরণ কারক)

আবার তিনি লাতিন ভাষার কারককের ছয়টি ভাগের কথা বলেছেন। তা হল—

1. Nominative Case (কর্তৃকারক)

6. Genitive ,, (সম্বন্ধপদ)

4. Dative ,, (সম্প্রদান কারক)

2. Accusative ,, (কর্মকারক)

5. Ablative ,, (অপাদান কারক)

6. Vocative ,, (সম্বোধন পদ)

লাতিন ভাষায় মূলত অনুসর্গ মূলক কারক লক্ষ্য করা যায়। তাই আমাদের কারকের সাথে তাদের কারক তুলনা সহজে মেলে না।

"বাংলা ভাষায় কারক চারটি একথা ভাষাবিজ্ঞানী উদয় কুমার চক্রবর্তী তার বইয়ে উল্লেখ করছেন।"[9] এগুলি হল—

১। কর্তাবাচক (Nominative)

২। কর্ম-সম্প্রদান বাচক (Accusative) (Dative)

৩। করণ-অধিকরণ বাচক (Locative)

৪। সম্বন্ধ বাচক (Possessive)

আবার সুকুমার সেন বলেন, আধুনিক বাংলায় চারটি কারক। তা হল—

১। কর্তা ২। কর্ম ৩। করণ-অধিকরণ ও ৪। সম্বন্ধ

তাহলে এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে অপাদান কারক ও সম্প্রদান কারক আধুনিক বাংলা কারকে ধরা হচ্ছে না।

[9]। বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন- উদয় কুমার চক্রবর্তী [২০১২ : ৯৮]

প্রকৃতপক্ষে বাংলা শব্দ-রূপ, সংস্কৃতের শব্দ-রূপ হতে নানা বিষয়ে পৃথক। বাংলায় কর্মকারক ও সম্প্রদান কারকের মধ্যে সাধারণতঃ পার্থক্য দেখা যায় না, এবং কর্তৃকারক, করণ কারক ও অধিকরণ কারকের রূপ অনেক সময়ে এক হয়ে যায়।

গঠন-প্রকৃতির দিক দিয়ে কারক তিনভাগে ভাগ করা যায় ১. মুখ্য কারক ২. গৌণ কারক ৩. সমন্ধপদ। এখানে মুখ্য কারকের মূল সম্পর্ক ক্রিয়ার সঙ্গে, ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রন করে কর্তা। নিম্নে মুখ্য ও গৌণ কারকের ছক দেওয়া হল—

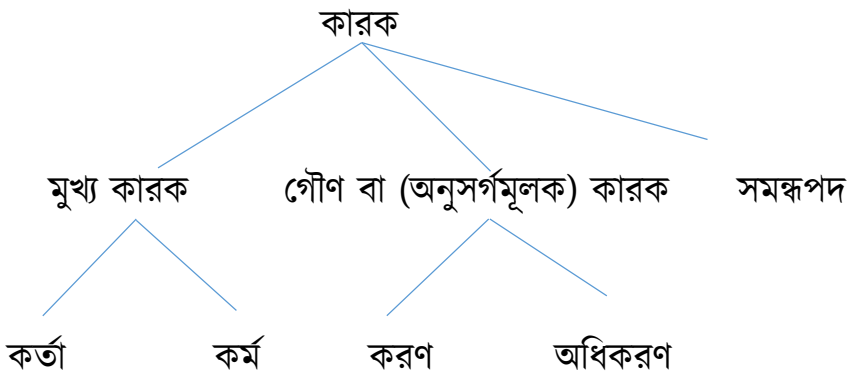

আধুনিক সময়ে এসে এই রূপ কারক শ্রেণীবিভাগের ধারণা পাওয়া যায়। আবার John M. Anderson 'Modern Case Grammar' এ- 'functional category'[10] ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ তিনি কারককে একটি কার্যকারী বিভাগ হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। মূলত ভাবে কারকের শ্রেণী বিভাগই প্রধান কথা নয়, কারকের প্রয়োগ বিদ্যাটা হল এর উদ্দেশ্য।

কারক ক্রিয়াপদ বা Verb দ্বারা পরিপূরক হয়। ক্রিয়াপদের মূল অংশ— অর্থাৎ যে মূল অংশে কাল ও ভাব বাচক, বচন ও পুরুষ বাচক এবং বিভিন্ন অসমাপিকা-অর্থবাচক বিকরণ ও বিভক্তি যোগ করে সমাপিকা ও অসমাপিকা পদ নিষ্পন্ন হয়- তাকে বলা হয় ক্রিয়া- ধাতু(Root)। আর এই ক্রিয়া পদ ধরে বাক্যে বিভক্তি যুক্ত হওয়া দেখতে পাই। মূলত বাক্যের শেষে যুক্ত হত বিভক্তি (বচন ও পুরুষ বাচক)। বিভক্তি ছিল দুই গুচ্ছ—

১। পরস্মৈপদ (Active)— পরস্মৈপদ বলতে এক কথায় বলা হয় 'পরের জন্য' অর্থাৎ যে ক্রিয়া পদের অর্থ অন্যের অনুকূল তা হল পরস্মৈপদ।

[10]. Modern Grammars of Case- John M. Anderson [2006: 191]

২। আত্মনেপদ (Middle)— আত্মনেপদ বলতে এক কথায় বলা হয় 'নিজের জন্য' অর্থাৎ যে ক্রিয়াপদের অর্থ কর্তার অনুকূল তা হল আত্মনেপদ।

"কর্তৃবাচ্যে ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়— ধাতু অনুসারে, শুধু আত্মনেপদ, শুধু পরস্মৈপদ, অথবা পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ দুই গুচ্ছের বিভক্তিই চলত, কিন্তু কর্ম ভাব বাচ্যে শুধু আত্মনেপদ গুচ্ছেরই বিভক্তি। এদিকে সুকুমার সেন বিভক্তির শ্রেণী কথা তার ভাষার ইতিবৃত্ত বইয়ে উল্লেখ করছেন।"[11]

১। বর্তমান কালে (লটে) যে বিভক্তি যোগ হত সেগুলির নাম প্রাথমিক বিভক্তি (Primary Endings)।

২। অতীত কালের (লঙ-লুঙের) বিভক্তিগুলির সাধারণ নাম দ্বৈতীয়িক বিভক্তি (Secondary Endings)।

এই দুই শ্রেণীর বাইরে ছিল সম্পন্ন কালের বিভক্তি (Perfect Endings) ও অনুজ্ঞা-ভাববাচক বিভক্তি (Imperative Endings)। এই বিধি ভাবের এই দুই রকম বিভক্তির প্রকারভেদ পাই।

[11]। ভাষার ইতিবৃত্ত- সুকুমার সেন [২০১৮ :২২৩]

তৃতীয় অধ্যায়

PLACE OF CASE IN THE ROLE OF SENTENCE (বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে কারকের ভূমিকা)-

বাক্য হল পদ সমষ্টি। আমরা জানি, বাক্য মধ্যে ক্রিয়াপদের সাথে বিশেষ্য (ও সর্বনাম) পদগুলির যে পরস্পর সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে আমরা কারক বলি। তার মানে এই যে, কারক ছাড়া বাক্য গঠন করা কথা ভাবাই যায় না। বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে কারকের গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষার মূল এককগুলি লক্ষ করার পর, একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে এসে উপনীত হতে হয়, তাহলে বাক্য বলব কাকে? আমরা দেখেছি যে, মুখের ভাষাই হোক আর লিখিত ভাষাই হোক, সবচেয়ে বড় একক হিসাবে বাক্য-কে করেছি। 'ধ্বনি' জুড়ে 'রূপ' আবার 'পদ' জুড়ে 'পদগুচ্ছ' এবং এক বা একাধিক পদগুচ্ছ নিয়ে একটি 'বাক্য'। বাক্য কতকগুলো শব্দ সহযোগে গঠিত, যার সাহায্যে সম্পূর্ণ একটা ভাব প্রকাশিত, যার সম্পর্কে কোন কিছু বলা হয়-গঠনভূত সেই অংশ বাক্যরূপে পরিচিত। সরল বাক্যের কর্তা বিশেষ্য বা সর্বনাম এবং এর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত থাকে বিশেষিত শব্দাবলী। সরল বাক্যের বিধেয় হচ্ছে ক্রিয়া, ক্রিয়াকে বিশেষিত শব্দাবলী ও ক্রিয়ার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত যে-কোন পরিপূরক।

আমরা জানি, প্রত্যেক বাক্যেই প্রধানতঃ দুইটি অংশ থাকে, একটির নাম উদ্দেশ্য বা অনুবাদ্য এবং অপরটির নাম বিধেয়। বিশেষণাদি দ্বারা এই উভয় অংশই পরিবর্ধিত হয়ে সুবৃহৎ বাক্যে পরিণত হয়।

যাকে উদ্দেশ্য বা লক্ষ করে বলা হয়, তার নাম উদ্দেশ্য (Subject)। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা কিছু বিধান করা যায় বা বলা যায়, তার নাম বিধেয় (Predicate)। যেমন— 'ছেলেটি ভদ্র'। এই স্থানে ছেলেটিকে লক্ষ্য করা হয়েছে বলে 'ছেলেটি' এই পদটি উদ্দেশ্য এবং 'ভদ্র' এই পদটি দ্বারা ছেলেটির গুণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে বলে, একে বিধেয় বলা হয়।

উদ্দেশ্য-বিধেয় বিভাজন যথেষ্ট বিশ্লেষণাত্মক নয়। উদ্দেশ্য-বিধেয় বাক্যের অন্বয়— এর উপর নির্ভরশীল— তথা বাক্যের অর্থবোধের উপর নির্ভরশীল। তাই বিন্যাসের ক্ষেত্রে পুনরুক্তি এসে পড়তে পারে। এবার কিছু বাক্যের উদ্দেশ্য-বিধেয় বিভাজন করে দেখা যাক—

উদ্দেশ্য	বিধেয়

১. সে আজ যাবে না

২. ঊর্মিলা ভালো মেয়ে

বাক্যের পুনরুক্তির ক্ষেত্রে এইরকম-

বিধেয়	উদ্দেশ্য	বিধেয়
আজ	সব	নীরব

বাক্যের উপরোক্ত বিন্যাস ছাড়াও গঠনের দিক থেকে যে শ্রেণীকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন—

১। সরল বাক্যে— সরল বাক্যে একটা উদ্দেশ্য-বিধেয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। উদ্দেশ্য বা কর্তা অথবা বিধেয় অথবা উভয়ই যৌগিক হতে পারে।

২। যৌগিক বাক্যে— যৌগিক বাক্যে দুই বা তার বেশি স্বাধীন খণ্ড বাক্য থাকতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক খণ্ড বাক্যের একটা করে উদ্দেশ্য ও বিধেয় থাকে এবং প্রত্যেকটা খণ্ডবাক্য একটা বাক্যরূপে হতে সক্ষম।

৩। জটিল বাক্য— জটিল বাক্যে একটা স্বাধীন খণ্ডবাক্য থাকে, একটা উদ্দেশ্য-বিধেয় গঠন একাকী ব্যবহৃত হতে সক্ষম এবং তার সঙ্গে একটা পরাধীন খণ্ডবাক্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। পরাধীন খণ্ড বাক্যের কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম ইত্যাদি থাকতে পারে, কিন্তু তা স্বাধীন খণ্ড বাক্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয় বলে তার সাহায্যে সম্পূর্ণ খণ্ডবাক্য একটা পদক্রম রূপে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে সেগুলো বাক্য রূপে একাকী ব্যবহৃত হতে অসমর্থ। পরাধীন খণ্ডবাক্য কর্তা, কর্ম, বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

গঠনগত দিক থেকে বাক্য এই তিন রকম শ্রেণীতে ব্যবহৃত হয়। আর এই তিন রকম শ্রেণীর বাক্যে কর্তা, কর্ম কারক প্রধান। তাই বাক্যে গঠনের ক্ষেত্রে কারকের ভূমিকা কতটুকু তা আমরা নির্ণয় করব।

বাক্যের গঠনমূলক দিক

প্রথমে আমরা বাক্য তৈরির গঠন সূত্র মধ্যে দিয়ে, বাক্যের বিভিন্ন উপাদানের শাখাবিন্যাস নির্দেশ করব। বাক্যের প্রকৃতির ওপর এই সূত্রের গঠন নির্ভরশীল। তা হল—

১. বাক্য

২. বাক্য ⟶ বিশেষ্য বাক্যাংশ ক্রিয়া বাক্যাংশ

৩. বিশেষ্য বা বাক্যাংশ ⟶ বিশেষ্য পূর্বপদ বিশেষ্য বচন বিশেষ্য উত্তর পদ

৪. বচন ⟶ একবচন বহুবচন

৫. ক্রিয়া বাক্যাংশ ⟶ সাহায্যকারী ক্রিয়া ও ক্রিয়া (বিশেষ্য বাক্যাংশ)

৬. সাহায্যকারী ক্রিয়া ⟶ ক্রিয়ার কাল (ক্রিয়ার ভাব) (পুরাঘটিত) (ঘটমান)

৭. ক্রিয়ার কাল ⟶ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ

৮. পুরাঘটিত⟶ আছে পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশ

৯. ঘটমান ⟶ হওয়া

১০. বিশেষ্য পূর্বপদ ⟶ নির্দিষ্ট বিশেষ্য উত্তরপদ অনির্দিষ্ট

গঠনমূলক ব্যাকরণে চলিত ভাষার গঠন সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতর উপাদানে বিভক্তি করণের পর সেগুলো বাছাই করা হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন উপাদানগুলো যেভাবে অর্থদ্যোতক রূপের সাহায্যে একত্রিত হয়, তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। পৃথিবীর সব ভাষাতেই তো কারক-বিভক্তি নেই। অথচ সে সব ভাষায় শব্দগুলির পারস্পরিক অন্বয় আছে। সেই অন্বয় বাক্য পদগুলির অবস্থান অনুসারে ঘটে। তাই কারক ব্যাকরণের ক্ষেত্রে বাক্যে অবস্থানটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। বাক্যগঠনে তার রূপতত্ত্বগত ভূমিকা লক্ষ করা হয়। বাংলা ভাষায় রূপতত্ত্বগত কারক আছে। ফলে, বাংলা ভাষায় সাধারণ ভাবে কারক-কে দুটি শ্রেণীতে রাখা হয়।

১। (Structural Case) বা সংগঠন কারক— সাধারণ ভাবে বাক্যগঠনে S. Structure (T.G বা Transformational Generative Grammar ব্যাকরণ অনুসারে অধিগঠন) বা এস. গঠনে বিশেষ্যগুচ্ছর সঙ্গে যুক্ত হয়। এবার T.G. Grammar বলতে যা বোঝায়— নোআম চমস্কি (Noam Chomsky) প্রবর্তিত রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ (Transformational Generative Grammar) প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা এবং সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণে মূল বক্তব্য তিনটে পর্যায়ে প্রসারিত : প্রথমাংশে— রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের প্রকৃতি, দ্বিতীয়াংশে— রূপান্তরমূলক ব্যাকরণমূলক ব্যাকরণের গঠন সম্পর্কিত

কয়েকটি প্রধান সূত্রের বিশ্লেষণ ও তৃতীয়াংশে— রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের সূত্রের পরিপ্রেক্ষিত সংক্ষেপে বাংলা বাক্যতত্ত্বের একটি দিকের বিশ্লেষণ।

চমস্কির Syantactic structures (১৯৫৭) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরমূলক পদ্ধতির সুত্রপাত হয়। তার বাক্যে তৈরির দুটি গঠন বাংলায় এইরকম—

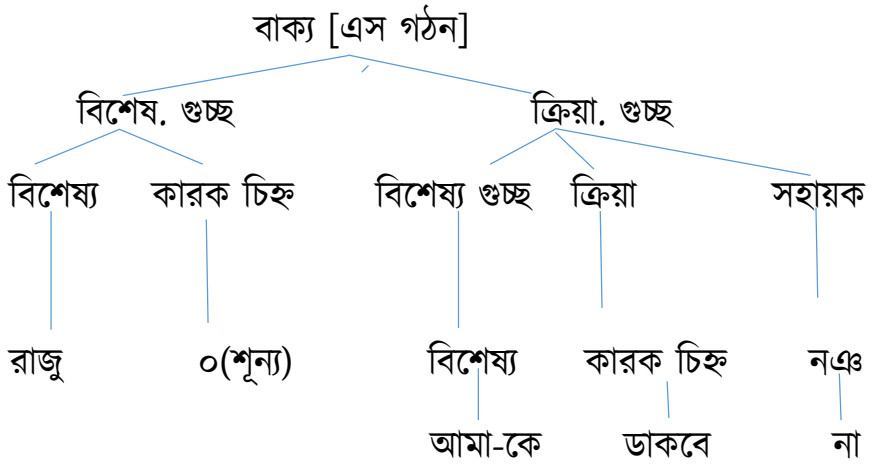

২. Inherent Case বা অন্তর্নিহিত কারক— বাক্যগঠনে S. Structure (T.G বা Transformational Grammar ব্যাকরণ অনুসারে অধোগঠন) বা ডি. গঠনে বিশেষ্যগুচ্ছে যুক্ত হয়। যেমন—

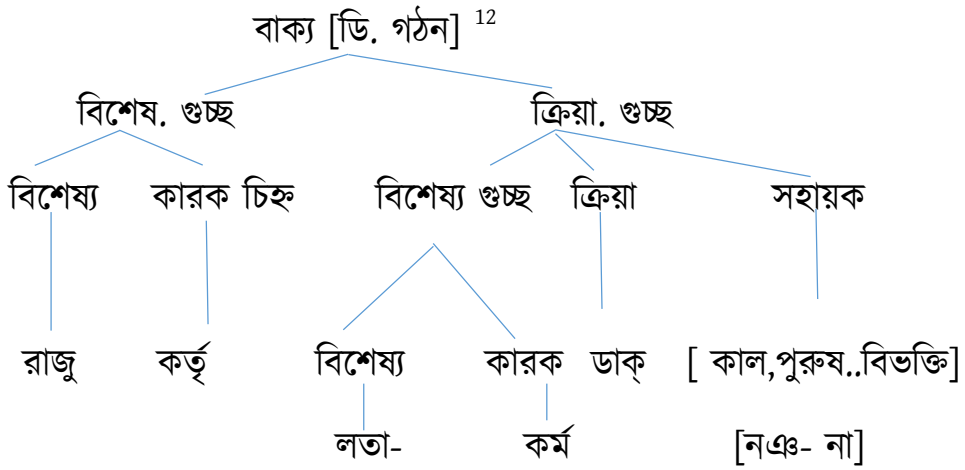

প্রত্যেক বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই দুটো স্তরই বিদ্যমান, একটা হচ্ছে অধিগঠন বা (Surface Structure) ও অন্যটি অধোগঠন বা (Deep Structure)। অধোগঠন সাধারণত

[12]। এস.গঠন ও ডি.গঠন- চমস্কি প্রবর্তিত পদগুচ্ছের গঠনের আদর্শের নিয়ম অনুসারে।

বাক্যের অর্থগত দিক স্পষ্ট করে নির্দেশ করে, অন্যদিকে অধিগঠন বাক্যের ধ্বনিগত দিক নির্দেশ করে। এবার উদাহরণের সাহায্য বাক্য অন্তর্গত দুটো দিক দেখা যাক—

বাক্য— রাজু আমাকে ডাকবে না।

উপরোক্ত বাক্য বিভিন্ন রূপান্তরের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পাওয়া যায়।

যেমন— ক. আমাকে রাজু ডাকবে না।

খ. রাজু কি আমাকে ডাকবে না?

এই বাক্যগুলির প্রত্যেকটিরই কতকগুলি মৌলিক অর্থ ও ব্যাকরণগত সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রত্যেকটি বাক্যেরই একটি স্বতন্ত্র রূপ বিদ্যমান। অধিগঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বাক্যই স্বতন্ত্র।

আমরা দেখি যে, Anderson, Fillmore প্রমুখ ব্যাকরণ বিন্যাসে Case Grammar বা 'কারক ব্যাকরণ' তৈরি করলেন। বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক গুচ্ছ আন্বয়িক কাজ বা ক্রিয়াকে গ্রহণ করা হয়েছে। শব্দার্থতত্ত্বগত (Semantic) ভূমিকা অনুসারে এদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। Anderson মনে করেন, "অন্তর্নিহিত কারক সব ভাষাতেই আছে।

বাক্যের উপাদান ক্রম—

অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও একটি বাক্যের প্রধান তিনটি উপাদান হল—

কর্তা – কর্ম - ক্রিয়া

ইংরেজি ভাষায় বলি— subject-object-verb

বাংলা বাক্যে তিনটি উপাদান [কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া]— এই ক্রমে ব্যবহৃত হয়। এই কারণে বাংলা বাক্য-র ধরণ কে আমরা [SOV] ধরণ বলে থাকি। যেমন—

"বাংলায়— [SOV]— আমি ফুটবল খেলি

ইংরেজিতে— [SVO]— Raja told him.

সংস্কৃত— [SOV]— নরো ব্যাঘ্র হন্তি

হিন্দি— [SOV]— উস্-নে খানা খায়া।"[13]

সংস্কৃত ভাষা সমন্বয়ী ও সবিভক্তিক ভাষা হওয়ার জন্য এর বাক্যের নানা ধরণ হতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে এর ধরন [SOV]। [কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া] প্রধান উপাদান হলেও বাংলা বাক্যে আরও নানা উপাদান ব্যবহৃত হয় এবং [SOV] ধরন-কে মান্য করে করে সেই উপাদান গুলিকে ও ক্রমে বিন্যস্ত করা হয়। বাংলা ভাষার বাক্যে ব্যবহৃত উপাদানগুলির স্বাভাবিক ক্রম হল—

কর্তা (Subject)	কালবাচক (Time)	স্থানবাচক (Place)	অ-প্রত্যক্ষ কর্ম (Indirect)	প্রত্যক্ষ কর্ম (Direct)	ক্রিয়া (Verb)
রাজা	আজ	কলেজে	তাকে	টাকা	দেবে
আমি	কাল	বাড়িতে	ওকে	জামাটা	দেবো

উপাদান গঠন—

বাক্যের উপাদান বিভিন্ন অংশে ভেঙে দেখানোর মধ্যে দুটো উদ্দেশ্য নিহিত—

(ক) বাক্যের বিশ্লেষণ তার সম্পর্কিত অংশের মাধ্যমে নির্দেশ।

(খ) বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ব্যাকরণগত বর্ণনা।

এই দুটো পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত তাই ভাষাতত্ত্বে এই প্রক্রিয়া অব্যবহিত উপাদান রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বাক্যের উপাদান হচ্ছে বাক্য বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয় কতকগুলো শাখা অংশ বিশেষ। উপাদান গঠনের অংশ বিশেষ বর্ণনায় যে ভাবে বাক্যে তার উপাদান সমূহে খণ্ডন সম্ভব এবং রূপমূলের কোন গ্রন্থি উপাদানরূপে ব্যবহৃত হবে, তা নির্দেশিত হয়ে থাকে। অন্য ভাবে বলা যায় যে, বাক্যের উপাদান বিশ্লেষণের সাহায্যে ক্ষুদ্রতম উপাদানগুলো একত্রিত হয়ে বৃহত্তর উপাদান গঠন করে বাক্যদেহ গঠনে সহায়তা করে। এই বিশ্লেষণ থেকে উপলব্ধ হয়, যে বাক্যের বিভিন্নতর উপাদান বিদ্যমান এবং বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান এবং কোন উপাদান কোন উপাদানের সাহায্যে মিলিত হয়ে বাক্যের রূপ গঠন করে। এর ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর উপাদানের বাক্যের গঠন যে-ভাবে বর্ণনা করা হয়, তা দেখানো যেতে পারে—

[13] । বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন- উদয়কুমার চক্রবর্তী [২০০৪ : ৬০]

যেমন— ভাল্লুকটা ছেলেটাকে ধাওয়া করেছিল।

এখানে এভাবে ধরা যায়— ওপরের এই উদাহরণে বাক্য কতকগুলো রূপমূল দ্বারা গঠিত (ভাল্লুকটা= ভাল্লুক+টা , ছেলেটাকে= ছেলে+টা+কে, ধাওয়া করেছিল)। ওপরের বাক্য বিশ্লেষণ করে অন্তর্ভুক্ত উপাদান বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এখানে ভাল্লুকটা ও ছেলেটা সমশ্রেণীর উপাদান ও ধাওয়া করেছিল স্বতন্ত্র শ্রেণীর উপাদান। বাক্যটি বিশেষ্য বাক্যাংশ+ বিশেষ বাক্যাংশ+ ক্রিয়ারূপে নির্দেশ করা যায়। এখানে বিশেষ্য বাক্যাংশ অভ্যন্তরীণ গঠন বিদ্যমান। বিশেষ্য বাক্যাংশ বিশেষ্য ও তার সঙ্গে বিশেষ্য উত্তর উপাদান দ্বারা গঠিত এবং ভাল্লুক ও ছেলে পরস্পরের প্রতিস্থাপন সম্ভবও –টা ও ধাওয়া করেছিল উপাদান থেকে স্বতন্ত্র। এখানে –টা বিশেষ্য ও ক্রিয়ার তুলনায় স্বতন্ত্র উপাদান উপাদান এবং ক্রিয়ার সঙ্গে কখনো ব্যবহৃত হয় না। তাছাড়া, যখন –টা বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তা বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয় এবং কোনক্রমেই বিশেষ্যের আগে নয় (এই নিয়মটি বাংলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। কেননা এক্ষেত্রে টাছেলে এই শ্রেণীর উপাদান বাংলায় অলভ্য ও অশুদ্ধ বলে মনে করা হয়। তাই বাক্যের গঠন হওয়া উচিত শুদ্ধ বা সহজলভ্য।

আমরা যদি বাক্য গঠনের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব উপাদান ক্রম বদল করে সংবর্তন চারটি বর্গে সাজানো যায়—

ক. বাক্যের উপাদানগুলির স্থান বদল। (Extra position)

খ. বাক্যের একটি উপাদানের বদলে আর একটি উপাদান স্থাপন। (Substitution)

গ. বিলোপন (deletion) জাতীয় সংবর্তন।

ঘ. যোগ বা উপাদান যোগ (addition) জাতীয় সংবর্তন।

এদেরকে বিপর্যাস জাতীয় সংবর্তন বলা যায়। এবার উপাদানের ক্রম বদল করে বাক্যের গঠন দেখব—

১। আমি আজ কলেজে তাকে খাতাটা দেবো।

২। আমি কলেজে আজ তাকে খাতাটা দেবো।

৩। আমি আজ তাকে কলেজে খাতাটা দেবো।

৪। আমি খাতাটা আজ কলেজে তাকে দেবো।

৫। আমি আজ তাকে খাতাটা কলেজে দেবো।

৬। আমি আজ খাতাটা তাকে কলেজে দেবো।

৭। আমি কলেজে আজ খাতাটা তাকে দেবো।

৮। আমি কলেজে তাকে খাতাটা আজ দেবো।

৯। আমি কলেজে তাকে আজ খাতা দেবো।

১০। আমি কলেজে খাতাটা তাকে আজ দেবো। ইত্যাদি বাক্য লক্ষ্য করা যায়।

কর্তা এবং ক্রিয়াকে না নড়িয়ে প্রায় ২০-২৩ প্রকার ক্রম বদল করা যায়। কর্তার অবস্থান পরিবর্তন করলে আরও বেশি প্রকার বদল করা সম্ভব হবে। তাহলে আমরা দেখতে পাই বাক্যে 'কর্তায়' প্রধান। আর তাই ব্যাকরণে 'কারক' বাক্যে গঠনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে, তা আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকেই দেখতে পাচ্ছি। এতে নতুন করে বলার কোন অবকাশ রাখে না।

বাক্যের অব্যবহিত উপাদান—

ব্যাকরণে বাক্য বিশ্লেষণ বিভিন্ন উপাদানগুলো শব্দ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো হয়। বাক্যের বিভিন্ন উপাদান ব্যাকরণগত লেবেলের সাহায্যে নির্দেশ করাই এই বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্য। যেমন—

কর্তা (Subject)	কালবাচক (Time)	স্থানবাচক (Place)	অ-প্রত্যক্ষ কর্ম (Indirect)	প্রত্যক্ষ কর্ম (Direct)	ক্রিয়া (Verb)
আমি	আজ	কলেজে	তাকে	খাতাটা	দেবো

বাক্যের অন্য শ্রেণীর বাস্তব ধর্মী রূপমূল বিশ্লেষণ অব্যবহিত উপাদান রূপে পরিচিত। এখানে বাক্যের গঠন বিভিন্ন উপস্তরে ভাঙার পর সেগুলো যেভাবে ব্যাকরণগত দিক থেকে প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক তা নির্দেশ করে ব্যাখ্যা করা হয়। এই শ্রেণীর বাক্য বিশ্লেষণে প্রথমেই যে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে তা হল যে, 'আমি' 'আজ কলেজে তাকে খাতাটা দেবো', আবার এটি এই ভাবে দেখানো যায়, 'আমি দেবো' ও 'আজ কলেজে তাকে খাতাটা' ইত্যাদি। বাক্যের বিভিন্ন রূপমূল বিশ্লেষণ ওপরে যেভাবে নির্দেশিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিই বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

বাক্যের অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ—

চমস্কি রূপান্তরমূলক উৎপাদক পদ্ধতির আগে গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বে অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্য বিচারই সর্বস্বীকৃত ভাষাতাত্ত্বিক রূপ ছিল। অব্যবহিত উপাদানের পরিপ্রেক্ষিত ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে তার প্রধান প্রধান অংশে বিভক্ত করা হয়। তারপর সেই প্রধান অংশগুলো বিভক্তি করণের সাহায্যে ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন—

ক. শহরের ভালো ছেলেগুলো সবসময় কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করে।

শহরের। ভালো। ছেলেগুলো। সবসময়। কাজকর্মে। ব্যস্ত থাকে।

শহরের। ভালো। ছেলেগুলো। সবসময়। কাজকর্মে। ব্যস্ত থাকে।

উপরোক্ত বাক্যেগুলো বিভিন্ন মুক্ত রূপমূলের সংযুক্তিগত দিকের পরিপ্রেক্ষিতে আরো ছোট অংশে বিভক্ত করা যায়। যেমন— ছেলেগুলো, ছেলে। গুলো।] এখানে বহুবচনের চিহ্নকে বিভক্ত করে দেখানো হয়েছে। এইভাবে অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্যের বিভিন্ন রূপমূলগুলো ভেঙ্গে দেখানো যেতে পারে।

উপরের (ক) বাক্যের গঠনরূপ বিভক্তিকরণের পর এইভাবে দেখানো যায়—

গঠন : বিশেষ্য ।। বিশেষণ ।। বিশেষ্য ।। ক্রিয়া বিশেষণ ।। ক্রিয়া

শহরের ভালো ছেলেগুলো সবসময় কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে।

বাক্যে নির্দেশকের ব্যবহার— আমরা বাক্যে প্রায় নির্দেশক শব্দ ব্যবহার করে থাকি। নির্দেশক শব্দকে "প্রত্যয়"[14] না "বিভক্তি"[15] বলব। টা/-টে/ টো, টি, গুলি, গুলা/গুলো কিসের বিভক্তি? আমাদের মতে এগুলি নির্দেশক বা Specifier— এর বিভক্তি। এগুলিতে সংখ্যা এক না একাধিক, সে অর্থের চেয়ে বেশি করে বলা হচ্ছে বস্তু/প্রাণী/ভাব ইত্যাদি

[14]। প্রত্যয়(Affix)– প্রত্যয় দ্বারা ক্রিয়া-প্রকৃতি অন্য ধাতু বা শব্দ সৃষ্টি করে। প্রত্যয়ান্ত পদকে প্রাতিপাদিক(Word-base) বলে।

[15]। বিভক্তি (Inflexion বা Termination)– এগুলির যোগে, শব্দ ও ধাতু, পদে পরিণত হয়ে বাক্যে প্রযুক্ত হয়। বিভক্তি-যোগের পরে শব্দে আর কিছু যোগ হয় না।

সুনির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট। এই সুনির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট করার রীতি মধ্য বাংলা থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মধ্য বাংলায়—

যেমন— 'পাঁচ গা গুয়া[16]' (পাঁচটি সুপারি) [এখানে মধ্য বাংলায় 'গা' নির্দেশক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হত।]

আধুনিক বাংলায় যেমন 'লোকটা' 'বইটা' বললে সমস্ত লোক বা সমস্ত বই থেকে একটি লোক বা একটি বইকে আলাদা করে নির্দেশ করা হচ্ছে ,ফলে 'টা' অনেকটা ইংরেজি-ফরাসি, জার্মান article— এর মতো ব্যবহৃত হয়। আবার 'লোকগুলো' 'বইগুলো' বললে, 'লোক' এবং 'বই' এর এক-একটা দলকে আলাদা মনে করা হয়। আমরা 'টা' শব্দকে 'একত্ব' ও 'গুলো' কে বহুত্ব হিসেবে ব্যবহার করি।

যেমন— ১। লোকটি মাছ ধরছে। [এই বাক্যে 'টি' শব্দ একত্বের অর্থ প্রকাশ করছে।]

২। লোকগুলো মাছ ধরছে। [এই বাক্যে 'গুলো' শব্দ বহুত্বের অর্থ প্রকাশ করছে।]

প্রতিনির্দেশক— বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যাবে প্রতিনির্দেশক দুটি বাক্যকে জুড়ে দেয়। এই জুড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ক্রমটি অনুসরণ করা হয়। যেমন— 'যে যাবে' আর 'সে এসেছে' এই দুটি বাক্যে একই ছিল। কর্তা এক না হলে প্রতিনির্দেশক ব্যবহৃত হবে না। প্রতিনির্দেশক আবার বচনের রূপ অনুসারে দেখানো যায়- ১। একবচনের রূপ ২। বহুবচনের রূপ। এবার কিছু কারকের প্রতিনির্দেশক দ্বারা বিশ্লেষণ দেখাবো—

একবচনের রূপ—

পূর্বনির্দেশক (কারক সহ)	অচিহ্নিত	পরনির্দেশক (কারক সহ) চিহ্নত
১। যে (কর্তা)	সে (কর্তৃ)/	তাকে (কর্ম)/ তার (সম্বন্ধ)
২। যিনি (কর্তৃ)	তিনি (কর্তৃ)/	তাকে (কর্ম)/ তাঁর (সম্বন্ধ)
৩। যাকে (কর্ম)	তাকে (কর্ম)/	সে (কর্তৃ)/ তার (সম্বন্ধ)

[16]। 'গুয়া' শব্দের অর্থ 'সুপারি'।

৪। যাঁকে (কর্ম)	তাঁকে (কর্ম)/	সে (কর্তৃ)/ তাঁর (সম্বন্ধ)
৫। যার (সম্বন্ধ)	তার (সম্বন্ধ)/	সে (কর্তৃ)/ তাকে (কর্ম)
৬। যাঁর (সম্বন্ধ)	তাঁর (সম্বন্ধ)/	সে (কর্তৃ)/ তাঁকে (কর্ম)

অর্থাৎ এগুলি এভাবে হবে—

যে-সে, যে-তাকে, যে-যার, যিনি-তিনি, যিনি-তাঁকে, যিনি-তাঁর ইত্যাদি বাক্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন— যে আসবে সে যেতে পারে।

এই ভাবে বাক্যে নির্দেশক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাহলে নির্দেশক-কে এক ধরনের বিভক্তি বলা যায়। তাই কারক গঠনের ক্ষেত্রে বাক্যে নির্দেশক বর্ণনার প্রয়োজন রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

কারকে ব্যাকরণগত সম্পর্ক (THE GRAMMATICAL CASE RELATION) —

ব্যাকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কারক ও বিভক্তি। আর এই ব্যাকরণে সবাই একে অপরের পরিপূরক। এদের মধ্যে রয়েছে শব্দতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, ইত্যাদি। তাই ব্যাকরণে প্রত্যেকটির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এদের মধ্যে যে কোন একটি শাখার আলোচনা করতে গেলে অপরগুলো সহায়তা ছাড়া আলোচনা যুক্তি সম্মত হয় না। কারণ এদের মধ্যে সকলেরই ব্যাকরণগত সম্পর্ক রয়েছে।

প্রথমে আলোচনার বিষয় হল ধ্বনি- ধ্বনি হল শব্দের মূল। আমরা জানি, ধ্বনি দুই রকম— ১। স্বরধ্বনি ২। ব্যাঞ্জনধ্বনি এই দুই ধ্বনি একত্রে মিলে শব্দ তৈরি করে। ধ্বনি ভাষাতাত্ত্বিক শৃঙ্খলা বিধান করে এবং যার সঙ্গে সম্পর্ক মূলধ্বনির, অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্বের ধ্বনিগুলি ভাষায় ব্যবহৃত চিহ্ন হিসাবে ক্রিয়াশীল হয়ে যোগাযোগ সহজসাধ্য করে তোলে। অন্যদিকে, মূলধ্বনির ভূমিকা হচ্ছে স্বাতন্ত্র্যসূচক, এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থের পার্থক্য নির্দেশ করা।

ভাষায় প্রত্যেক ধ্বনি এমনভাবে সঙ্গবদ্ধ হয়ে থাকে, যার পরিপ্রেক্ষিত একটিকে অন্যের সদস্য বলা যায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, পারস্পরিক সম্পর্কই হচ্ছে মৌল ভিত্তি এবং একটি ধ্বনির সম্পর্ক নির্দেশিত হবে সুসমঞ্জস্য পরিকল্পের মাধ্যমে। প্রত্যেক ধ্বনি উচ্চারণীয় ও শব্দগত উপাদানে গঠিত, যেমন— গান এর মধ্যে ধ্বনি গুলো (গ+আ+ন) অর্থাৎ এখানে তিনটি ধ্বনি মিলে একটা শব্দ গঠিত হল। ধ্বনি ভাষাতাত্ত্বিক একক এমনভাবে ক্রিয়াশীল হয় যে সেগুলির মাধ্যমে যোগাযোগ সম্পদনা করা যায়।

এরপর যদি আলোচনা করতে হয় তা হল শব্দ। কারণ ভাষার মুখ্য সম্পদ হল শব্দভাণ্ডার। যে ভাষার শব্দভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ সে ভাষা তত শব্দশক্তিতে উন্নত। আর এই শব্দশক্তির প্রধান উৎস দুইটি,-ধাতুতে অথবা শব্দে প্রত্যয় যোগ করে নতুন শব্দ নির্মাণ, এবং অপর ভাষা হতে শব্দ। শব্দের মধ্যে সংস্কৃত, গ্রীক, ইংরেজী বিদেশি মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, এর ফলে নতুন শব্দ নির্মাণ হয়। এখানে আমরা শব্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পেলাম।

একের পর এক শব্দ বসে বাক্য তৈরি করে। যেমন— 'আমি বাড়ি যাব'। এখানে তিনটি শব্দ রয়েছে, প্রত্যেকটি শব্দ অর্থমূলক, আর এই তিনটি শব্দ পাশাপাশি বসে একটা বাক্য তৈরি হয়েছে। 'আমি' হল বাক্যের 'কর্তা' অর্থাৎ 'কর্তা' হল কারক। আর এই রকম শব্দ কোথায় কি রকম বসবে তা নির্ভর করে শব্দের অর্থের উপর। শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়, যেমন- 'তোমাকে' শব্দটি তোমা+কে= তোমাকে এখানে 'কে' টা হল বিভক্তি। 'কে' শব্দটি যুক্ত হয়ে বিভক্তির অর্থ প্রকাশ করছে।

বাংলায়, যেমন সংস্কৃতে, নূতন শব্দ গঠন করা যায় দুটি প্রধান উপায়ে, (১) ধাতুতে ও পুরানো শব্দে প্রত্যয় ও উপসর্গ যোগ করে, এবং (২) দুই বা ততোধিক পুরানো শব্দ জুড়িয়ে দেয়। প্রথমে উপায়ে পাই প্রত্যয়ান্ত (Derivative) শব্দ, দ্বিতীয় উপায়ে পাই সমাসবন্ধ (Compound) শব্দ।

প্রকৃতিতে (অর্থাৎ ক্রিয়াধাতুতে অথবা মূল শব্দে) যা যোগ করলে নূতন শব্দ উৎপন্ন হয় তাকে প্রত্যয় (Suffix) বলে। প্রত্যয় দুই শ্রেণীর— (ক) কৃৎ(Primary) (খ) তদ্ধিত (Secondary)। যে প্রত্যয় ক্রিয়াধাতুতে যুক্ত হয় তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যে প্রত্যয় শব্দে যুক্ত হয় তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। কৃৎ-প্রত্যয়যুক্ত শব্দকে বলে কৃদন্ত, তদ্ধিত-প্রত্যয়যুক্ত শব্দকে বলে তদ্ধিতান্ত।

এখন এই সমস্ত প্রত্যয় যোগ করে নূতন শব্দ গড়া চলে না। বাংলা ধাতুতে সংস্কৃত প্রত্যয় যোগের উদাহরণ দুই- একটি মাত্র মিলে। যেমন— কহতব্য ('কহ' বাংলা ধাতু+'তব্য' সংস্কৃত প্রত্যয়)। বাংলায় কৃৎ-প্রত্যয়ের তুলনায় তদ্ধিত- প্রত্যয়ের সংখ্যা বেশি। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা কৃৎ প্রত্যয় সম্পর্কে যে ধারণা পাই—

"কিন্তু বাংলা কৃৎপ্রত্যয় অ, অত, অন্ত, আ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নূতন শব্দ গড়ে ওঠে। যেমন- 'আ' প্রত্যয় ক্ষেত্রে যদি লক্ষ্য করা যায়— তাহলে 'আ' প্রত্যয় ধাতুর উত্তরে এই প্রত্যয় বসে যে শব্দের সৃষ্টি হয়, তা একক ব্যবহৃত হয় না, অন্য শব্দের সাথে মিলিত বা সমস্ত হয়ে তবে ব্যবহৃত হয়, কর্তা, করণ বা অধিকরণ অর্থে এই সমস্ত পদ প্রযুক্ত হয়।

যেমন— ভাত রাঁধা হাঁড়ী [করণ কারক], ভাত রাঁধা বামন [কর্তা], গলা কাটা দাম [অধিকরণ বা করণ] ইত্যাদি।"[17]

[17]। সংক্ষিপ্ত ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ- সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় [১৯৪৫ : ১০৩]

নূতন শব্দ গঠন করতে যেমন প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয়, তেমনি বাক্যাংশ তৈরি করতে সমাসের প্রয়োজন হয়। "বাংলায় সমাস পদ্ধতি মোটামুটি আদি ভারতীয়-আর্যেরই অনুযায়ী।" [18] তবে সংস্কৃত মতো বহুশব্দের বাক্যাংশ সমাস ছাড়া অন্যত্র চলে না। বাংলায় সাধারণত দুটির বেশি শব্দ জুড়ে সমাস করা যায় না। অর্থযুক্ত একাধিক পদ জুড়ে সমাস গঠিত হয়। তাই বলা যায়—

পরস্পরের সাথে অর্থ-সম্বন্ধ যুক্ত একাধিক পদ, মিলিত হয়ে একটি পদে পরিণত হলে, এই মিলনকে সমাস বলে। এই প্রকারের সমাস হতে জাত শব্দ বা পদকে সমস্ত-পদ বলে। যে পদগুলির সমাস হয় তাকে তাদের প্রত্যেকটিকে সমস্যমান পদ বলে। সমস্যমান পদগুলির পরস্পরের সাথে সম্বন্ধ যে বাক্যের সাহায্যে বিশ্লেষ করে (সমাস ভেঙ্গে) সেই বাক্যকে ব্যাস-বাক্য, বিগ্রহ-বাক্য বা সমাস-বাক্য বলে। যেমন— চাঁদ ও মুখ এই দুই সমস্যমান পদ একত্র হয়ে হল। চাঁদ মুখ পদের ব্যাস-বাক্য হবে, চাঁদের মত মুখ অথবা চাঁদের মত মুখ যাহার। সমাস-বদ্ধ হলে, যেখানে অন্বয়-যুক্ত বিভক্তির লোপ হয় না, সেই সমাসকে অলুক সমাস বলে। যেমন— মামার-বাড়ী, মুখে-ভাত, কাঠের-দরজা ইত্যাদি, এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময়ে সমস্ত-পদ না বললেও চলে, যদিও শব্দ দুইটি একত্র বসে সম্মিলিত-পদের ভাব প্রকাশ করে। এবার সংক্ষিপ্ত একটু সমাসের পরিচয় দেওয়া যাক যেগুলো কারক-বিভক্তির সঙ্গে যুক্ত।

প্রধানত সমাস আট প্রকার— ১। দ্বন্দ্ব-সমাস ২। তৎপুরুষ-সমাস ৩। বহুব্রীহি-সমাস ৪। কর্মধারয়-সমাস ৫। দিগু-সমাস ৬। ব্যতিহার-সমাস ৭। অব্যয়ীভাব ৮। ক্রিয়াসমভিব্যাহার।

অলুক দ্বন্দ্ব সমাস— বাংলা বিভক্তি-যুক্ত পদের দ্বন্দ্ব প্রচুর, এগুলিকে বাংলায় অলুক দ্বন্দ্ব বলা যায়। যেমন- হাতে-পায়ে, মাঠে- ঘাটে ইত্যাদি। [এগুলো সাধারণত অধিকরণ কারক]

তৎপুরুষ সমাস— যে সমাসে দ্বিতীয় পদটি প্রথম পদের লুপ্ত কারকের হেতু সরূপ, তাকে তৎপুরুষ বলে। যেমন- মন-গড়া [করন-বাচক তৃতীয়া তৎপুরুষ, ঘর-ছাড়া [অপাদান-বাচক পঞ্চমী তৎপুরুষ] ইত্যাদি।

[18]। সংস্কৃতে সমাসের ব্যাপারে পানিনির অনুশাসন সব সময় মানা হয়নি। কথ্য সংস্কৃত ভাষায় সমাস ব্যবহারে বৈচিত্র্য ছিল এবং পরিবর্তী কালের সাহিত্যে। বাংলা সমাস পধতি অনেক অংশে কথ্য সংস্কৃতের তথা অপভ্রংশ অনুযায়ী।

কর্মধারয় সমাস— এই শ্রেণীর প্রথম পদটি দ্বিতীয়টির বিশেষণ রূপে অবস্থান করে, এবং দ্বিতীয় পদের অর্থ বলবৎ থাকে। বিশেষণ ও বিশেষ্য, বিশেষ্য ও বিশেষণ, বিশেষণ ও বিশেষণ, বিশেষ্য- সকল প্রকারের শব্দযোগে কর্মধারয় সমাস হয়। এই কর্মধারয় সমাস অনেক প্রকারের হয়। বিশেষণ পূর্বপদ বসে হয়, হেড-মাস্টার, ভাঙ্গা-হাট ইত্যাদি।

সাধারণত শব্দযোগ ও পদের অবস্থান মিলে সমাস তৈরি হয়। কারকের আলোচনার ক্ষেত্রেই এই সমস্ত শব্দযোগ ও পদের ব্যবহার ছাড়া গঠন করা সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা ব্যাকরণগত সম্পর্ক রয়েছে। তাই এদের কোনটাই বাদ দেওয়া চলে না।

পদের আলোচনার আগে প্রাচীন ও মধ্যবাংলা পদের ব্যবহারগুলো আলোচনা করব। কারক যা দিয়ে গঠিত হয় তা হল— পদ বা বাক্যের অংশ বা ইংরেজিতে যাকে বলছি Part of Speech। এর আগের অধ্যায়ে 'কারকে বাক্যের ব্যবহার' দেখিয়েছি। এই অধ্যায়ে আমরা কারকের সঙ্গে কি কি ব্যাকরণ সম্পর্ক রয়েছে তা আলোচনা করার চেষ্টা করব।

প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় পদের ব্যবহার—

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (সংস্কৃত) রূপ প্রধান ছিল। অর্থাৎ বাক্য মধ্যে পদগুলির পরস্পর-সম্পর্ক বিভক্তি হতে বোঝা যায়। বাক্য মধ্যে পদগুলির বিন্যাসের মোটামুটি নিয়ম ছিল, কিন্তু সে নিয়মের ব্যতিক্রমও যথেষ্ট ছিল এবং ব্যতিক্রম ঘটলেও বাক্যের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হত না। যেমন— 'কৃষ্ণদয়াল এক দয়ালু রাজা' এবং 'দয়ালু রাজার নাম কৃষ্ণদয়াল' এই দুটি একই বাক্য। ফলে পদের ব্যতিক্রম ঘটলেও বাক্যের অর্থ কিন্তু প্রায় এক। আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, প্রাচীন মধ্যে বাংলায় পদ পর্যায়ের রীতির ব্যতিক্রম সংস্কৃতের তুলনায় প্রাকৃতে অনেক কম দেখা যায়। সেই জন্য পদরীতির গুরুত্ব ভাষার প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক স্তরে ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এবার এই পদের গুরুত্ব প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় দেখে নেওয়া যাক—

প্রাচীন বাংলা পদ— প্রাচীন বাংলার নিদর্শন বলতে স্বল্পকায় চর্চাগীতি মাত্র। যা পদ্যে রচিত। তবে সে উপাদান স্বল্প হলে ও পদবিধিতে ভাষার প্রকৃতি খানিকটা বোঝা যায়। চর্চাগীতির প্রায় বাক্য ছোট ও সরল। যৌগিক বাক্য নেই, যেহেতু সংযোজক অব্যয়ের এ কাজে প্রয়োগ তখন ও সিদ্ধ হয়নি। পাশাপাশি সরল বাক্য সাধারণ যৌগিক বাক্যের কাজ

করে। যেমন— "সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ" (= শ্বশুর নিদ্রা গেল, বউড়ী জেগে আছে)।

কর্তা-কর্মে বিভক্তিহীনতার জন্য পদ্যে, অর্থাৎ যেখানে সিদ্ধ পদক্রম নেই সেখানে, কর্তা ও কর্ম পৃথক করতে গেলে ক্রিয়ার অর্থের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন এখানে "গুরু পুচ্ছিঅ জাণ"।

প্রাচীন বাংলায় পদে নামশব্দ নির্দেশক প্রত্যয়ের ব্যবহারের সূত্রপাত হয়েছিল। যেমন— "পঞ্চবি ডাল" বা পাঁচটি ডাল। প্রাচীন বাংলায় 'বি' নির্দেশক প্রত্যয় আধুনিক বাংলায় 'টি' হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ভাবে নির্দেশক প্রত্যয়গুলোর পদের সঙ্গে যুক্ত করে ব্যবহার হতে থাকে।

ক্রমবর্ধমান বিভক্তিহীনতার পরিপূরক রূপে সহায়ক পদের ব্যবহার বেড়েছে। প্রাচীন বাংলায় গৌণ ও মুখ্য কর্মের পার্থক্য বোঝানোর জন্য সহায়ক পদ ব্যবহার হয়ে থাকে।

মধ্য বাংলা পদ— প্রাচীন বাংলার মতো মধ্য বাংলার বস্তুপ্রায় সম্পূর্ণ পদ্য রচনা। মধ্য বাংলার পদবিধি প্রাচীন বাংলায় অনুযায়ী। শব্দরূপে নতুন করে বহুবচনে পদের গঠন মধ্য বাংলায় দেখা দিয়েছিল,- প্রথমে সর্বনামে পরে নামশব্দে। প্রায় এই সমস্ত 'আমরা' 'তোমরা' পদ সৃষ্ট হয়েছিল। চৈতন্য ভাগবতের প্রয়োগ হতে বোঝা যায় ষষ্ঠী জাতীয় পদ ব্যবহার হত।

অসমাপিকায় কর্তৃপদের ব্যবহার চৈতন্যভাগবতে কিছু কিছু দেখা যায়। যেমন— "আমি থাকিবার স্থান করিব বিরল" এখানে কর্তা 'থাকিবার জন্য স্থান' পদ ব্যবহারের ফলে অসমাপিকা ক্রিয়া কাজ করছে। মধ্য বাংলায় এই রকম পদ বিরল দেখা যায়। এছাড়াও অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া মধ্য বাংলায় দেখা যায়।

আধুনিক বাংলা পদ— বাংলা ভাষার পদ বিধির পরিপূর্ণ বিবরণ, যা পদ্যময় প্রাচীন ও মধ্য ও বাংলা ভাষা পদবিধির পরিপূর্ণ বিবরণ, যা পদ্যময় প্রাচীন ও মধ্য বাংলা থেকে পাওয়া সম্ভব ছিল না, তা আধুনিক বাংলায় পাওয়া যায়। পদবিধির দিক দিয়ে প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক বাংলার মধ্যে মৌলিক ও গভীর কোন পার্থক্য নেই। আধুনিক বাংলার ধারণা ভিত্তিতে, কারকে পদের ব্যবহার—

১। বিশেষ্য— বিশেষ্য ব্যক্তি, স্থান বা বস্তুর নাম নির্দেশে ব্যবহৃত। বিশেষ্য কর্তা, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কর্ম, বিধেয় বিশেষ্য, বিশেষক প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত। যেমন— রাম ভালো

ছেলে। এখানে ‘রাম’ হল নাম পদ বা বিশেষ্য পদ। আর বাংলা বিশেষ্যে কারক ও বচন বিদ্যমান।

২। বিশেষণ— যে-সব পদ বিশেষ্য বা নামবাচক বিশেষ্য বিশেষিত করে, সেগুলো বিশেষণরূপে পরিচিত। আমরা বিশেষণ পদ বলতে বুঝি বিশেষ্যের যে দোষ,গুণ ইত্যাদি বোঝায়। যেমন— রাম ভালো ছেলে। এখানে ‘ভালো’ হচ্ছে বিশেষণ পদ। ভালো শব্দটি বাক্যের গুণ বোঝায়।

৩। সর্বনাম— বিশেষ্য পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তা সর্বনাম রূপে পরিচিত। অন্যভাবে বলা যে, বিশেষ্যের স্থানে যে পদ ব্যবহৃত হতে পারে, তাকে সর্বনামে রূপে গ্রহণ করা যায়। আর এই সর্বনাম বা (বিশেষ্য) পদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের যে সম্পর্ক, তাকে আমরা কারক বলছি। বিশেষ্য পদের মানে হল নামপদ, আর এই নামপদ যেমন— রাম বাড়ি যায়। সে বাড়ি যায়। এখানে ‘রাম’ এর পরিবর্তে ‘সে’ হল সর্বনাম পদ। যে-সব বিশেষ্যের পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তার সাহায্যে সর্বনামের শ্রেণী ও ক্রিয়াগত দিক নির্দেশিত হয়ে থাকে। সর্বনামের গঠন কারক ও বচন ভেদে পরিবর্তিত হয়।

৪। ক্রিয়ারূপ (Verb From)— ক্রিয়ারূপ অর্থের দিক দিয়ে সমাপিকা এবং অসমাপিকা এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। সাধারণত ভারতীয় ভাষাগুলিতে বাক্যের গঠনে অসমাপিকার ভূমিকায় নানা রকম বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা সমাপিকা ক্রিয়াকে গঠনের দিক থেকে দু’ভাবে বিভাজিত করা যায়। একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়ার গঠন এবং একাধিক সমাপিকা ক্রিয়ার গঠন। যেমন— একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া হল— যায়, খায়, গেলো ইত্যাদি এবং একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া হল— নিয়ে যায়, দেখা হবে ইত্যাদি। মূল ধাতুর সঙ্গে নানা বিভক্তি যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়ারূপ গঠিত হয়। আর অসমাপিকা ক্রিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দুটি বাক্য বা পদগুচ্ছকে সংযোজিত করা।

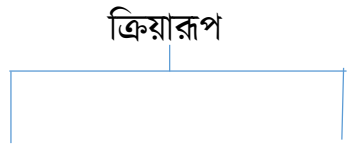

সমাপিকা

[সে বাড়ি এলো]

অসমাপিকা

[সে দেখা-দেখি করে লিখল]

ক্রিয়ারূপ গঠন — "ধাতুমূল এর সঙ্গে আমরা বিভক্তি যোগ করে সাধিত ধাতু তৈরি করতে পারি যেমন নামধাতু। ক্রিয়ারূপ গঠনে প্রকার বিভক্তি অথবা কাল বিভক্তি যোগ করতে পারি। আর পুরুষ বিভক্তি সর্বদা যুক্ত হয়। তাই, ক্রিয়ারূপের গঠন দাঁড়ায়—

"[ধাতুরূপ + বিভক্তি^{1} + বিভক্তি^{1} + বিভক্তি^{1} + বিভক্তি^{1}]"

এবার প্রসঙ্গক্রমে বিভক্তি গুলির রূপ নিয়ে আলোচনা করব—

সাধিত বা বিস্তার বিভক্তি— "বাংলা সাধিত বিভক্তিকে বিস্তার বিভক্তি বলা যায়। বাংলা বিস্তার বিভক্তি একটিমাত্র।

যেমন— -'আ'= কর্ + -আ= করা

প্রকার বিভক্তি – বাংলা প্রকার বিভক্তি দুটি – -'ছ' এবং '-এছ'

-আছ> -ছ- (-ছ-)= করছো

-ইআছ > (-ই + -আছ) > -এছ্= করেছো।"[19] [বাংলায় সাধারণত -'ছ' এবং '-এছ', 'ইআছ' প্রত্যয় হিসেবে জানি, কিন্তু এখানে প্রকার বিভক্তিতে 'বিভক্তি' দেখানো হয়েছে।]

কাল বিভক্তি— কাল বিভক্তি পাঁচটি পুরুষেই অপরিবর্তিত থাকে। কাল বিভক্তি অনুসারে বাংলায় ক্রিয়ার কাল চারটি। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং নিত্যবৃত্ত। নিম্নে বিভক্তি অনুসারে ক্রিয়ার কাল দেওয়া হল—

কাল	বিভক্তি	উদাহরণ
অতীত	-ল-, -ইল-	[আমি ভাত খা –ইল – আম (=খেলাম)]
বর্তমান	-ও-	[আমি ভাত খা –ই-]
ভবিষ্যৎ	-ব-	[আমি ভাত খা –ই = -ব- -ও (=খাবো)]
নিত্যবৃত্ত	-ত-	[আমি ভাত খা -ই- -ত- -আম (=খেতাম)]

এই রকমভাবে বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার কালকে সম্পদনা করে।

[19] । বাংলা পদ্গুচ্ছের সংগঠন- উদয়কুমার চক্রবর্তী [২০১২ : ১৩১]

বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক গঠনে [SOV] ক্রিয়া-র অবস্থান বাক্যের শেষ অংশে। কর্ম-ক্রিয়া গঠন হিসাবে [OV] দেখি। ফলত, ক্রিয়া মধ্যে কর্ম হিসাবে বিশেষ্য উপস্থিত থাকে। ক্রিয়া ছাড়া বাক্যে কারকের গঠন সম্পূর্ণ হয় না। বাক্যে গঠনে ক্রিয়া সহয়তা করে। বাক্যে ক্রিয়ার অবস্থান—

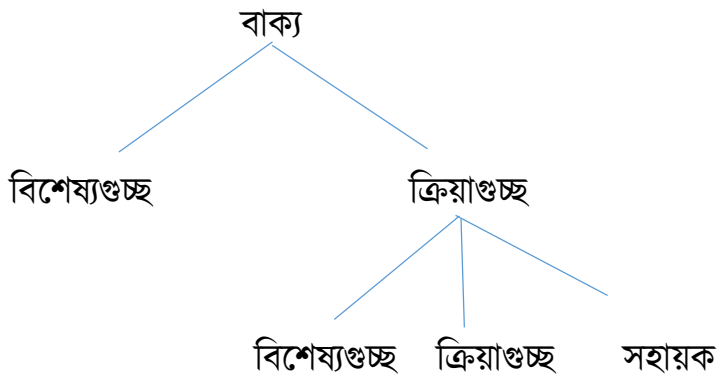

এছাড়াও ক্রিয়া-কে আর দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়- ১। ক্রিয়া-বিশেষ্য ২। ক্রিয়া-বিশেষণ।

ক্রিয়াবিশেষ্য— ক্রিয়াবিশেষ্য বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। বাক্যকে পরিচালনার করার জন্য ক্রিয়াবিশেষ্যের দুটো দিক লক্ষ করা যায়—

১। বাক্যের অন্তর্বর্তী উপাদানকে আবদ্ধ।

২। বাক্যের বহির্গত উপাদানকে আবদ্ধ করা।

"বাক্যের অন্তর্বর্তী উপাদান ক্রিয়াবিশেষ্যর সঙ্গে বাক্যের কর্তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কারকগত সম্পর্ক ভাষার ক্ষেত্রে একটি বিশ্বজনীন বিষয়।"[20] সাধারণ ভাবে ক্রিয়াবিশেষ্য বাক্যের কর্তাকে সম্বন্ধবাচক পদে পরিণত করে।

যেমন— আমার যাওয়া হবে। [যাওয়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ রয়েছে]

এবার ক্রিয়াবিশেষ্যের ক্ষেত্রে বাক্যের বহির্গত উপাদানের ভূমিকা।

যেমন— কাল বাড়ি যাবো বলে | আমার খুব আনন্দ হল।

[20] । Modern Grammars of Case- John M. Anderson [2006: 22-24]

এখানে ‘যাবো’ এই ক্রিয়াবিশেষ্য বাক্য ব্যবহৃত হয়ে একটি একটি আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছে। সেই আকাঙ্ক্ষা হল অন্য একটি বাক্যকে সংযুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা। এইভাবে ক্রিয়াবিশেষ্যের ভূমিকাকে লক্ষ্য করা যায়।

ক্রিয়াবিশেষণ— ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়া, বিশেষণ বা অন্য ক্রিয়াবিশেষণ-কে বিশেষিত করে। অনেক সময় ক্রিয়া-বিশেষণ, ‘কেমন, কোথায়, কখন, কতখানি’ এই শ্রেণীর শব্দের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়। তাই সেক্ষেত্রে ক্রিয়াবিশেষণে বিভক্তি চিহ্ন থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতেও পারে। বিভক্তিহীন এমন তদ্ভব পদ আসলে দ্বিতীয়া অথবা সপ্তমী পদ। যেমন— ‘বেশি বেশি কথা বলে’, ‘ধীরে ধীরে যাও’। বাংলা ক্রিয়া-বিশেষণে সাধারণত –এ, -এঁ বিভক্তির প্রয়োজন দেখা যায়। যেমন— প্রাচীন বাংলার ক্ষেত্রে দেখি ‘ভরণই গহন গম্ভীরে বেগে গাহী [গম্ভীরে এই পদে ‘এ’ বিভক্তি যোগ হয়েছে], আধুনিক বাংলার ক্ষেত্রে যত্ন করে কাজ কর। [করে এই পদে ‘এ’ বিভক্তি যোগ হয়েছে]

এমন কিছু কিছু পদ লক্ষ্য করা যায় যে গুলোতে বিভক্তি নেই। যেমন— ‘খুব ভালো’, ‘আস্তে চলো’।

৫। অব্যয়— বাংলা ব্যাকরণে, অব্যয়গুলি-কে নানাভাবে লক্ষ্য করা যায়। পদান্বয়ী অব্যয়, বাক্যান্বয়ী অব্যয়, সমুচ্চয়ী অব্যয়, প্রভৃতি। অর্থগত বিচারে অব্যয় কখনো অর্থহীন, আবার কখনো অর্থযুক্ত। অব্যয় বাক্যের অর্থ সংযোজন করে।

যেমন— ১। তুমি কি ভাত খাবে? [এই বাক্যে ‘কি’ হল প্রশ্নবোধক অব্যয়]

২। কই তোমার মতো আর কাউকে দেখতে পাই না? [এই বাক্যে ‘কই’ হল প্রশ্নবোধক অব্যয়, এবং ‘আর’ হল সংযোজক অব্যয়।]

কি, কই, আর এই সবকটি অব্যয় বাক্যের অর্থ প্রকাশ পেয়েছে।

বচন

যার দ্বারা কোন কিছুর সংখ্যার বিষয়ে আমাদের যে বোধ জন্মে, তাকে বচন বলে। সাধারণ ভাষায় আমরা বচনকে দুই ভাগে ভাগ করি। যেমন— ১। একবচন ২। বহুবচন।

১। একবচন— একটি মাত্র বস্তু বোঝালে একবচন বলে। যেমন- মানুষ, গাছ, পাখি ইত্যাদি।

২। বহুবচন—একের অধিক বোঝালে বহুবচন বলে। যেমন- মানুষেরা, গাছগুলি ইত্যাদি।

কারকে শব্দরূপ গঠনে বচনের সঙ্গে ব্যাকরণগত সম্পর্ক রয়েছে। কারকে পদের আলোচনার পাশাপাশি শব্দে বচন প্রয়োগের একটা সুস্পষ্ট ধারণা ব্যাখ্যা করব। আমরা যদি আদি বাংলার দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব আদি ভারতীয়-আর্যে শব্দরূপে তিন বচন ছিল— একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। কথ্য সংস্কৃতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই দ্বিবচনের ব্যবহার ছিল। অন্যথা একাধিক বোঝাতে বহুবচনই ব্যবহৃত হত। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় দ্বিবচন নেই, তবে আছে শুধু এক-আধটি দ্বিবচন পদ— সর্বনাম ও সংখ্যা।

প্রাচীন থেকে আধুনিক বাংলার বচন ব্যবহারের প্রয়োগগুলো দেখব। প্রাচীন বাংলায় শব্দরূপে বহুবচন-একবচন ভেদ নেই। উভয় বচনে কারকের একই রূপ। মধ্য বাংলায় বহুবচনের পদ নতুন করে ক্রমশ দেখা দিলেও মোটামুটি বলতে গেলে একবচন বহুবচন ভেদ নেই। সপ্তদশ সতাব্দ হতে কর্তা কারকে বহুবচনে 'রা' বিভক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্য কারকে বহুবচনে প্রত্যয় [দিগ], [দে] এসেছে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে ফারসি হতে। এখন প্রধানত [দিগ], [দে] সাধুভাষায় লক্ষ্য করা যায়। এই প্রত্যয়ের পরে বিশিষ্ট কারক-বিভক্তি যুক্ত হয়।

"কর্তৃকারক সমন্ধ পদ জাত [রা, এরা] বিভক্তিযোগ লক্ষ্য করা যায়"।[21] আর এই [রা, এরা] বিভক্তিযোগ গুলো যেমন- আমরা, তাহারা, এই শব্দ দুটিতে 'রা' 'এরা' বহুবচন পদ ব্যবহার হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দী হতে এই বিভক্তি প্রথমে আ-কারান্ত অন্য সর্বনাম পদে ও বিশেষ্য, পরে ও অন্য-স্বরান্ত বিশেষ্য পদে যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন— যাহারা, তারা, বালকেরা ইত্যাদি। ব্যক্তি নামেও এই বিভক্তির ব্যবহার হয়, তবে তা অভিবিধি-বহুবচন অর্থে। গুলো ,গুলা আসলে নির্দেশক বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করে।

তির্যক কারকের বহুবচনের প্রাতিপাদিক প্রত্যয় রূপে [দিগ] যোগ সপ্তদশ শতকের শেষ দিক হতে পাওয়া যায়। আবার [দিগর] এই প্রত্যয় পরে যথারীতি কারক-বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— তাহাদিগকে, তাহাদিগের ইত্যাদি। আমরা দেখতে পেলাম কারকে বচনের ব্যবহার অনেক আগে থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এই ভাবে ব্যাকরণে বচনের ধারণা পাওয়া যায়।

[21]। যে সম্বন্ধ-বিভক্তি কর্তা বহুবচনে- বিভক্তিতে পরিণত হয়েছিল তার কিছু ইঙ্গিত প্রাকৃত ভাষায় লক্ষ্য করা গিয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

আদি-মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা কারকের বিবর্তিত রূপ(THE BANGLA CASES IN EARLY-MEDIEVAL AND MODERN PERIOD OF EVOLUTION)

আমরা বাংলা সাহিত্যে তিনটি যুগের কথা জানি, ১. আদি বা প্রাচীন ২. মধ্য ও ৩. আধুনিক যুগ। কোন কিছু ভালো ভাবে জানতে হলে তার ইতিহাসটা-কে আমরা পর্যবেক্ষণ করি। কারণ আগে কি ছিল আর এখন কি আছে বা পরিবর্তিত হয়েছে নাকি, তা জানার জন্য আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসকে জানার চেষ্টা করি। সাহিত্যের যেমন ইতিহাস রয়েছে, তেমনি ভাষার ও ইতিহাস রয়েছে। ভূমিকা অংশে ভাষার আদি-মধ্য ও আধুনিক যুগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। আমরা জানি, সময়ের সাথে সাথে ভাষা ব্যবহার পাল্টাচ্ছে। তাই ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সময়টা হল গুরুত্বপূর্ণ। কারকের বিবর্তিত রূপ হিসাবে প্রথমে প্রাচীন বাংলার লক্ষণ গুলো আলোচনা করব—

প্রাচীন বাংলার লক্ষণ

প্রাচীন কিংবা প্রত্ন ও আদি স্তরের বাংলায় চর্চাগীতির ভাষা অনুসারে এই বিশেষত্বগুলি দেখা যায়।

১। এই চর্চাগীতির পদান্তে স্বরধ্বনি বজায় ছিল, তবে অনেক সময় যুক্তস্বর [-ইঅ] ঈ (ই)-কারে পরিণত হল। যেমন— ভণতি > ভণই, সংবোধিত > সংবোহিঅ ইত্যাদি।

২। [-এর, অর,-র] বিভক্তির দ্বারা সম্বন্ধপদ নিষ্পন্ন হত। যেমন— "রুখের তেন্তলি" (গাছের তেঁতুল), "ডোম্বীএর সঙ্গে" (=ডোমনীর সঙ্গে)। এই র-কারান্ত সম্বন্ধপদ যে বিশেষণ সে ধারণা তখনও লুপ্ত হয়নি, তাই এটা মূলত বিশেষ নিয়ম অনুসারি।

৩। প্রাচীন বাংলার ক্ষেত্রেও অপাদানের অর্থে অধিকরণের অর্থ নিহিত থাকায় অপাদানের অর্থে অধিকরণের বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন— চর্চাপদে "জামে কাম কি কামে জাম" (জন্ম হতে কর্ম নাকি কর্ম হতে জন্ম) এই পদে অধিকরণ কারকের 'এ' বিভক্তি লক্ষ্য করা যায়।

৪। কর্মভাব-বাচ্যে ক্রিয়াপদে অতীত কালে [-ই, -ইল] এবং ভবিষ্যৎ কালে [-ইব] বিভক্তি যুক্ত হত। ক্রিয়া "সকর্মক"[22] হলে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি যুক্ত হত, আবার "অকর্মক"[23] হলে প্রথমা বিভক্তি। এই ধরনের ক্রিয়াপদ কর্তৃপদের বিশেষণ রূপে গন্য ছিল।

যেমন— ১। "চলিল কাহ্ন" (বা কৃষ্ণঃ চলিতঃ) ২। "মই ভাইব" (বা ময়া ভাবিতব্যম্)
'ই','ইল' (বিভক্তি যোগ) 'ইব'(বিভক্তি যোগ)

এই পদ দুটির মধ্যে একটি অতীত কাল আর একটি ভবিষ্যৎ কাল। এই পদের যে বিভক্তি চিহ্নগুলি প্রাচীন বাংলায় যুক্ত ছিল, তা এখনকার সাধু ভাষায় সেগুলি লক্ষ্য করা যায়। যেমন— খাইব, দেখিল ইত্যাদি।

তাই এমন কিছু কিছু বিভক্তির প্রয়োগ রয়েছে, যা আদি বাংলায় ছিল তা বর্তমান বা আধুনিক বাংলায় মোটামুটি সেই ধরনের লক্ষণ গুলি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়ারও প্রাচীন বাংলায় আর কিছু লক্ষণ রয়েছে, কিন্তু এখানে সংক্ষিপ্ত দেখানো হল।

মধ্য বাংলার লক্ষণ

মধ্য বাংলার প্রধান বিশেষত্ব লক্ষণ গুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব—

১। আ-কারের পরস্থিত ই-কার ও উ-কার ধ্বনির 'ক্ষীণতা, এবং পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনি স্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন— বড়াই> বড়া।

২। অসমাপিকার ক্রিয়ার সঙ্গে 'আছ' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠন। যেমন— লইছে < লই +(আ)ছে যুক্ত হয়ে 'লইয়াছে', এই 'লইয়াছে' পদটি পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক চলিত বাংলায় 'নিয়েছে' হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৩। আবার বক্তার প্রাতিমুখ্য ও আভিমুখ্য বোঝাতে 'গিয়া' ও 'সিয়া' (< আসিয়া) এই দুই অসমাপিকার ক্রিয়াপদে অনুসর্গ রূপে ব্যবহার দেখা যায়। যেমন— ১. দেখ গিয়া ২. দেখ সিয়া। এই পদ দুটি আধুনিক বাংলায় দেখ গিয়ে, দেখ আসিয়া ব্যবহৃত হয়। এখানে মধ্য বাংলা থেকে আধুনিক বাংলায় এই দুটি পদ 'আ' পরিবর্তে 'এ' ধ্বনি পরিবর্তিত হয়েছে।

[22]। সকর্মক ক্রিয়া কর্মের সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদিত করে। যেমন- নীহার নদীতে ঝাপ দিল।

[23]। অকর্মক ক্রিয়া হল কোন কর্ম ছাড়াই ক্রিয়া সম্পদনা করে। যেমন- সে হাসল।

৪। সাধু ও চলিত ভাষায় ঢ়-কারের এবং 'নহ', 'মহ' এই দুই নাসিক্য মহাপ্রাণের মহাপ্রাণতার লোপ পায়। যেমন— বুঢ়>বুড়, কাহ্ন>কান ইত্যাদি।

৫। পদান্ত অ-কারের ক্রমবর্ধমান লোপ প্রবণতা দেখা যায়। যেমন— ভাত>ভাৎ, দাস>দাস্ ইত্যাদি।

৬। বিশেষ্য কর্তার বহুবচন [রা] বিভক্তি এবং নির্দেশক বহুবচনে [-গুলা, -গুলি] বিভক্তি, তির্যক্ কারকের বহুবচনে [-দি, -দিগ] বিভক্তি। রা, গুলা, গুলি বহু আগে থেকে ব্যবহার চলছে, কিন্তু [দিগ] বিভক্তি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে দেখা যায়নি। আসলে এই বিভক্তি গুলি পদ ছিল। এছাড়ারও মধ্য বাংলায় আর কিছু লক্ষণ রয়েছে, কিন্তু এখানে সংক্ষিপ্ত দেখানো হল।

আধুনিক বাংলার লক্ষণ

আমরা জানি, অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ হতে বাংলার আধুনিক স্তরের শুরু। এই স্তরের প্রধান লক্ষণ গুলো হল—

১। লেখার ভাষা ও মুখের ভাষা হতে স্বতন্ত্র হয়ে সাধুভাষা রূপে সাহিত্যের বাকরীতি প্রকাশ পায়। মধ্যভাগের শেষ দিকে লেখার ভাষা ও কথ্য ভাষার মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আধুনিক বাংলায় আর তা লক্ষ্য কর যায় না।

২। সাধুভাষায় যুক্ত ক্রিয়া পদের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। যেমন— দান করা, পান করা, গান করা ইত্যাদি।

৩। আধুনিক বাংলা উপভাষার লক্ষণ একটা বিশেষ বিশেষত্ব লাভ করেছে। এই আধুনিক উপভাষা পাঁচটি, সেগুলোর এলাকা ভিত্তিক এক এক রকম লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৪। আধুনিক বাংলার সমাপিকা ক্রিয়াপদের পরিবর্তে অসমাপিকা ব্যবহার করে একাধিক বাক্যকে একটিমাত্র সরল বাক্যরূপে প্রকাশ পায়। যেমন— পাপাই এখানে আসল। সে দেখল। সে অবাকহল। এই তিনটি বাক্য একত্রে লিখলে হবে— পাপাই এখানে এসে অবাক হয়ে দেখল।

৫। আধুনিক বাংলায় অনেক মিশ্রিত শব্দ লক্ষ্য করা যায়। এই মিশ্রিত শব্দ— ইংরেজি, আরবি, ফারসি ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। যেমন— লণ্ঠন, বেঞ্চি, চেয়ার ইত্যাদি।

৬। গদ্য রীতির প্রসার ঘটল এই আধুনিক বাংলায় এসে, তার আগে পদ্যের প্রসার ছিল। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্য ভাগ হতে সাহিত্যে দিগন্তের ও দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটল।

ধীরে ধীরে এই ভাবে আধুনিক বাংলার প্রসার পেতে থাকল। প্রাচীন থেকে আধুনিকের মধ্যে ভাষা ব্যবহারের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তা এই উপরোক্ত আলোচনা থেকে এর দৃষ্টান্ত পাই।

কারক বিভক্তির বিবর্তিত রূপ প্রকাশের আগে আমাদের ভাষার এই লক্ষণ গুলো অবশ্যই জানা দরকার ছিল। এই লক্ষণ গুলোর পরিচয় না পেলে বিবর্তনের রূপ ধারণা একটু দুষ্কর হয়ে ওঠে। আধুনিক বাংলা কারক ধারণায় চার-পাঁচ প্রকারের বর্ণনা পাই। কিন্তু বিবর্তনের রূপ হিসাবে প্রাচীন বাংলা তথা সংস্কৃত নিয়মে আমরা যে সাত রকম বা (সম্বোধন পদ দেখিয়ে আট রকম) কারকের ধারণা পেয়েছি, তা দিয়ে আলকপাত করার চেষ্টা করব।

কর্তৃকারক

যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ বাক্যস্থিত ক্রিয়া সম্পন্ন করে বা করায়, তাকে বাক্যের ‘কর্তৃকারক’ বা কর্তাকারক বলে থাকি। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের পূর্বে ‘কে’ অথবা ‘কি’ (অর্থাৎ ‘কোন বস্তু’) যোগ করে প্রশ্ন করলেই উত্তর দ্বারা কর্তা কারক পাওয়া যায়। এবার প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগের কর্তৃকারকের চিহ্ন ও উদাহরণ বর্ণনা করব—

প্রাচীন বাংলায়— ০(শূন্য), ও, -এ , আবার “অনুক্ত”[24] কর্তায়- এঁ/এ ইত্যাদি।

যেমন— ১। কুম্ভীরে খাই। ২। কাহ্নে গাই। [চর্চাপদ]
‘এ’ ‘এ’ [বিভক্তি]

মধ্য বাংলায়— শূন্য বিভক্তি,-এঁ/-এ, অনুক্ত কর্তায় একই বিভক্তি।

যেমন— ১। ‘না ছাড়ে নান্দের পোএ’, গাইল চণ্ডীদাসে। [শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পদ]
‘এ’ [বিভক্তি] ‘এ’ [বিভক্তি]

আধুনিক বাংলায়— শূন্য বিভক্তি, -এ,(-ই) ইত্যাদি।

[24]। অনুক্ত মানে হল- অনিয়োজিত, অপ্রধান, অভাষিত ইত্যাদি।

এখানে প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক বাংলায় লক্ষণ গুলো প্রায় একই। খুব একটা চিহ্ন গুলোর বিবর্তন ঘটেনি।

যেমন— ১। লোকে বলে। ২। বাঘে খায়।
'এ' [বিভক্তি] 'এ' [বিভক্তি]

প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত কর্তৃ বা কর্তাকারকে বিভক্তির বিবর্তন সে রকম দেখা যায় না। 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ প্রায় সব যুগেই দেখা যায়।

কর্মকারক

কর্তা যাহা করে তাহাই কর্ম, বা যে বস্তুকে অবলম্বন করে ক্রিয়ার কর্ম হয়, তাকে কর্মকারক বলা হয়। ক্রিয়াপদের উত্তরে 'কি' বা 'কাহাকে' দ্বারা প্রশ্ন করে কর্মকারক পাওয়া যায়। এবার প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগের কর্ম কারকের চিহ্ন ও উদাহরণ বর্ণনা করব—

প্রাচীন বাংলায় — শূন্য বিভক্তি, -এঁ/-এ, আবার কখনো কখনো 'ক' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

যেমন— ১। 'গুরু পুচ্ছিঅ'। ২। তান্তি বিকণঅ ডোম্বী। [চর্চাপদ]
'শূন্য' [বিভক্তি] শূন্য' [বিভক্তি]

৩। মতিএ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা।
'ক' [বিভক্তি]

মধ্য বাংলায়— শূন্য বিভক্তি, -এ, -ক/কে, -(এ) রে, - ত/তে ইত্যাদি।

যেমন— ১। চতুর্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাও। [শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পদ]
'তে' [বিভক্তি]

২। রাধাক বুলিল নিঠুর বানী।
'ক' [বিভক্তি]

আধুনিক বাংলায়— শূন্য বিভক্তি, -কে, -রে ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায় অনির্দিষ্ট মুখ্যকর্মে বিভক্তি বসে না।

যেমন— ১। সে মাছ বিক্রি করে। ২। শিশু চাঁদ দেখে। [এখানে কোন বিভক্তি বসেনি]

৩। সে মাছকে খণ্ড করল।

'কে' [বিভক্তি]

কর্মকারকে প্রাচীন যুগের থেকে বেশি বিবর্তন ঘটেছে মধ্যযুগে। আধুনিক যুগে এসে বিভক্তির প্রয়োগ কমতে থাকে। যে বিভক্তি গুলো মধ্যযুগে ব্যবহার হয়েছে সে বিভক্তি গুলি আধুনিক যুগে শুধু 'কে', 'রে' বিভক্তি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

করণ কারক

কর্তা যার সাহায্যে যে কাজ সম্পাদন করেন, তাকে করণ কারক বলা হয়। ক্রিয়ার পূর্বে 'কিসের' বা 'কাহার দ্বারা', কাহার সাহায্যে যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাহাই করণ কারক। এবার প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগের করণ কারকের চিহ্ন ও উদাহরণ বর্ণনা করব—

প্রাচীন বাংলা— শূন্য বিভক্তি, এঁ/এ, এতেঁ, -ই(অ) ইত্যাদি।

যেমন— ১। তোহরেঁ দোসেঁ। [প্রাচীন বাংলার বেশিভাগ পদে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার উল্লেখ্য]
এঁ [বিভক্তি]

২। মিছা কর্মরে। [কর্মের দ্বারা]
'এ' [বিভক্তি]

৩। আলিএঁ কালিএঁ বাট রূদ্ধেলা।
'এঁ' [বিভক্তি]

মধ্য বাংলা— শূন্য বিভক্তি, এঁ/এ, -ত/তে ইত্যাদি।

যেমন— ১। কান্দিয়া জানাইবোঁ কাশেঁ। ২। দেহ মোর সরস বচনে।
'এঁ' [বিভক্তি] 'এ' [বিভক্তি]

আধুনিক বাংলা— শূন্যবিভক্তি, -এ, -(এ) তে ইত্যাদি।

যেমন— ১। কলমে লিখ। ২। হাতে কল চালানো হয়। ৩। ঘিয়ে ভাজা।
'এ' [বিভক্তি] 'এ' [বিভক্তি] 'এ' [বিভক্তি]

৪। সেবায় তুষ্ট।
'য়'[বিভক্তি]

করণ কারকে প্রাচীন যুগে এঁ/এ, এতেঁ বিভক্তি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেটার বিবর্তিত রূপ হিসাবে মধ্যযুগে ‘এ’ ‘তে’ ব্যবহার হয়। এখানে মধ্যযুগের যে বিভক্তি, আধুনিক যুগে সেই বিভক্তি গুলো লক্ষ্য করা যায়।

সম্প্রদান কারক

স্বত্বত্যাগ করে যা কিছু দান করা যায়, তাকে সম্প্রদান কারক বলে থাকি। ‘কাকে’, ‘কার’ ‘জন্য’, ইত্যাদির দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় ,তাহাই সম্প্রদান কারক। এবার প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগের সম্প্রদান কারকের চিহ্ন ও উদাহরণ বর্ণনা করব—

প্রাচীন বাংলা— -এঁ/এ, -ক/কে/কু, -(এ)রে/রেঁ ইত্যাদি।

যেমন— ১। কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা (কালার দ্বারা বোবা যেমন সংবোধিত হয়)।
‘এঁ’ [বিভক্তি]

২। কাহ্নে গাই। (কৃষ্ণের দ্বারা গীত হয়)
‘এ’ [বিভক্তি]

মধ্য বাংলা— শূন্য বিভক্তি, -এ, -ক/কে, (এ) –রে/রেঁ, -ত, তে (বিরল) ইত্যাদি।

যেমন— ১। দোঁহে কৈলা অনলে প্রণতি।
এ [বিভক্তি]

আধুনিক বাংলা— আধুনিক বাংলায় দ্বিতীয়া বিভক্তির অনুরূপ –এ, -কে, -রে ইত্যাদি বিভক্তির সাহায্যে সম্প্রদানের অর্থ জ্ঞাপিত হয়।

যেমন— ১। ভিক্ষুককে পয়সা দান কর। ২। গুরু শিষ্যকে পাঠ দেয়।
‘কে’ [বিভক্তি] ‘কে’ [বিভক্তি]

৩। অন্ধজনে দেহ আলো।
‘এ’ [বিভক্তি]

প্রাচীন বাংলায় যেরূপ বিভক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তা মধ্যযুগে সেই বিভক্তি ছাড়াও আর কিছু বিভক্তি যুক্ত হয়। কিন্তু আধুনিক যুগে এসে ‘বিভক্তির’ বিবর্তন আর লক্ষণীয়।

অপাদান কারক

যে স্থান-বাচক, আধার-বাচক বা কাল-বাচক বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ হতে বাক্যস্থিত ক্রিয়া-পদের দ্বারা অপসরণ বা সরে যাওয়া বোঝায়, তাকে অপাদান-কারক বলে। 'কি' বা 'কাহা হতে', 'কিসের থেকে', ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে অপাদান-কারক পাওয়া যায়। এবার প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগের অপাদান কারকের চিহ্ন ও উদাহরণ বর্ণনা করব—

প্রাচীন বাংলা— শূন্য বিভক্তি, -এঁ/এ, -ত, উ, 'হু/হুঁ' ('হু/হুঁ' এই বিভক্তির নিদর্শন খুব কম পাওয়া যায়।) ইত্যাদি।

যেমন— ১। দশবর- রঅণ হরিঅ দস দিসেঁ। (দশ শ্রেষ্ঠ রত্ন আহৃত হল দশ দিক হতে)।
'এঁ' [বিভক্তি]

২। 'তঁই বিণু' ।
'উ'[বিভক্তি]

৩। 'হু/ হুঁ' বিভক্তির ব্যবহার যেমন- 'আজহুঁ' [পরবর্তীতে এই বিভক্তির ব্যবহার আর রক্ষিত হয়নি।]

মধ্য বাংলা— এঁ/এ, -ত/তে, (এ) রে, -কে, কারে ইত্যাদি।

যেমন— ১। মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহী। (মা বাবার থেকে বড় গুরুজন কেউ নেই)
'ত' [বিভক্তি]

২। তোমা হতে শ্রেষ্ঠ বীর নাহিক ভুবনে।
'এ' [বিভক্তি]

৩। রাজপথে যায় সাধু নগরে নগর।
'এ' [বিভক্তি]

আধুনিক বাংলা— তৃতীয়া ও সপ্তমীর ক্ষেত্রে 'এ' বা 'তে' বিভক্তি এবং ষষ্ঠীর ক্ষেত্রে 'র' বিভক্তি যোগ হয়।

যেমন— ১। খনিতে সোনা পাওয়া যায়। ২। তিল হতে তেল হয়।
'তে' [বিভক্তি] 'এ' [বিভক্তি]

৩। রাজুর চেয়ে নীহার বয়সে ছোট।
'র' [বিভক্তি]

অপাদান কারকের ক্ষেত্রে বিভক্তির বিবর্তন লক্ষ্যণীয়, প্রাচীন বাংলায় যে রকম বিভক্তি দেখা যায় মধ্যযুগে সেগুলো কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বাংলায় এসে এই চিহ্নগুলোর ব্যবহার আরও কমে যায়।

সম্বন্ধ–পদ

যার সাথে কোনও পদার্থের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ থাকে, এবং উক্ত পদার্থকে যা বিশিষ্টকে করে দেয় তাকে সম্বন্ধ- পদীয় বা সম্বন্ধ-পদ বলা হয়। এই পদের ক্ষেত্রে 'কার', 'কিসের' এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা সম্বন্ধ পদ পেয়ে থাকি। এবার প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগের সম্বন্ধ পদের চিহ্ন ও উদাহরণ বর্ণনা করব—

প্রাচীন বাংলা— শূন্য বিভক্তি থাকতেই পারে নাও পারে, -ক, -(এ), র/ -রি ইত্যাদি।

যেমন- ১। কাহরি নাবেঁ (কার নৌকায়)। ২। তোহোর বিণান।
'এ' [বিভক্তি] 'র' [বিভক্তি]

৩। আপন কাজক লাগি।
'ক' [বিভক্তি]

মধ্য বাংলা— -(এ)র, -ক, -কার/কের, -রে, এর, -ক ইত্যাদি।

যেমন— ১। যমুনাক তীরে ২। জরমকতরে।
'ক' [বিভক্তি] 'ক' [বিভক্তি]

৩। সুখের তরে।
'এর' [বিভক্তি]

আধুনিক বাংলা— বাংলা সম্বন্ধ অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি 'র' 'এর' ইত্যাদি প্রযুক্ত হয়।

যেমন— ১। নদীর তীর। ২। গাছের ছাল। ৩। বাঘের ভয়। ৪। মামার বাড়ী।
'র' [বিভক্তি] 'র' [বিভক্তি] 'র' [বিভক্তি] 'র' [বিভক্তি]

৫। কলমের আঁচড়।
'এর' [বিভক্তি]

সম্বন্ধ পদে প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় 'ক' বিভক্তি দেখা যায়, এছাড়া আর যে সমস্ত বিভক্তি রয়েছে তা কিছুটা বিবর্তন ঘটেছে আর আধুনিক সম্বন্ধ পদে শুধু 'র' 'এর' বিভক্তি প্রয়োগ দেখা যায়।

অধিকরণ কারক

যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ, বাক্যস্থিত ক্রিয়ার আধার বা স্থান, অথবা কাল বোঝায় তাকে আমরা অধিকরণ কারক বলে থাকি। 'কোথায়, কিসে, কখন, কবে' এই সমস্ত পদ-যুক্ত প্রশ্নের উত্তর করলে অধিকরণ কারক পাওয়া যায়। এবার প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগের অধিকরণ কারকের চিহ্ন ও উদাহরণ বর্ণনা করব—

প্রাচীন বাংলা— শূন্য বিভক্তি, -(অ)ই, এঁ/এ, -ত, -রে ইত্যাদি।

যেমন— ১। দুআরত চিহ্ন দেখইআ ২। গঅণে উঠিআঁ
'ত' [বিভক্তি] 'এ' [বিভক্তি]

মধ্য বাংলা— এঁ/এ, -ই, -ত/তে, -ক, কে, -রে ইত্যাদি।

যেমন— ১। তব ঘরে আসিতে। ২। চান্দরে চান্দকান্তি জিম পরিহাসঅ।
'এ' [বিভক্তি] 'এ' [বিভক্তি]

৩। আইনু তোমার বাস (এখানে কোন বিভক্তি বসছে না)

আধুনিক বাংলা— এ, তে ইত্যাদি।

যেমন— ১। জলে কুমীর। ২। ভোরে সূর্য ওঠে। ৩। বাড়িতে লোক আছে।
'এ' [বিভক্তি] 'এ' [বিভক্তি] 'এ' [বিভক্তি]

অধিকরণ কারকে বিভক্তির বিবর্তিত রূপের মধ্যে শুধু আধুনিক বাংলায় বিভক্তির প্রয়োগ কমে, প্রাচীন ও মধ্যবাংলায় যেরূপ বিভক্তির চিহ্ন লক্ষ করা যায় তা আধুনিক বাংলায় সেরূপ লক্ষ্য করা যায় না, এখানে শুধু 'এ' 'তে' বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়।

এখানে মোট সাত রকমের কারকের আলোচনা করা হল। আর প্রাচীন ও মধ্যযুগের জন্য এই সাত রকম কারক-বিভক্তি আলোচনা প্রযোজ্য। কিন্তু এই সময়ে দাঁড়িয়ে এই সাত রকম কারকের ব্যবহার লক্ষ্য করি না। কোন কোন ভাষা বিজ্ঞানী সাত-আট রকম কারকের প্রয়োগ দেখিয়েছেন আবার কেউ কেউ শুধু আধুনিক কারকের ব্যবহারের

অবস্থান সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত আলোচনার আলোকপাত করেছেন। কিন্তু আমার গবেষণার বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক যুগের কারকের আলোচনার পাশাপাশি প্রাচীন ও মধ্যযুগের কারকের আলোচনা করতে হয়েছে। কেননা কোন ব্যাকরণ শেখার জন্য তার আগের মুহূর্তের ইতিহাসগুলো একটু জানা প্রয়োজন। আমরা জানি কোন সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ হল ভাষা। ভাষার সঠিক ব্যবহারের জন্য ব্যাকরণ বিদ্যা শেখার প্রয়োজন হয়। আর এই ব্যাকরণ অন্যতম অংশ হল কারক-বিভক্তি প্রয়োগ বিদ্যা।

আসলে একটা কথা ভালো করে বোঝার বিষয় রয়েছে,— আমরা সাধারণত সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে থাকি। এই সময়ে কি করলে ভালো হবে আর কি করলে মন্দ হবে এই সব ভাবনা আমাদের মধ্যে কাজ করে। আর এই ভালো-মন্দের বিচার যখনই চলে আসবে তখন সবকিছুরই বিচার বিশ্লেষণ করা সুবিধে হবে। এখানে এই কথা বলার কারণ হল ‘কোন বিষয়ের ভালো-মন্দ বিচার শেখা’। ব্যাকরণে এই সমস্ত ভালো-মন্দ জানা বা শেখার ব্যাপারটা চলে আসে।

উপসংহার

সমস্ত আলোচনার পরিশেষে বলতে পারি যে, আমরা প্রাচীন থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত ভাষার যে সমস্ত লক্ষণ ও ব্যবহারের প্রয়োগ দেখতে পেলাম তা থেকে আমাদের ধারণা হয় যে, সময়ের সাথে সাথে ভাষারও বিবর্তন ঘটছে। এই ভাষা নিয়ে তৈরি হয় ব্যাকরণ। আর ব্যাকরণের অন্যতম অংশ হল কারক-বিভক্তি।

আধুনিক বাংলা এই চার রকম কারককে দেখানো যেতে পারে—

কারক	বিভক্তি
কর্তৃ	শূন্য বিভক্তি, -এ (-য়ে,য়),-তে, -এতে ইত্যাদি।
কর্ম ও সম্প্রদান	-এ (-য়ে,য়), -ক,-কে,-রে, (-এরে) ইত্যাদি।
করণ ও অধিকরণ	-এ (-য়ে,য়), -ত, -তে, (-এতে) ইত্যাদি।
সম্বন্ধপদ	-র, -এর ইত্যাদি।

এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রত্যেকটি কারকে ‘এ’ বিভক্তি বর্তমান। আমরা কর্ম ও সম্প্রদান কারকের একই বিভক্তি এবং করণ ও অধিকরণ কারকের একই বিভক্তি লক্ষ্য করছি। দুটো কারকের একই বিভক্তি সেক্ষেত্রে কর্ম কারক আর ঐদিকে অধিকরণ কারক বেছে নিলে কারক সংখ্যা অবশ্যই কমে যাবে। তাহলে কারক সংখ্যা হবে চারটি। আর আধুনিক যুগে এসে অপাদান কারকের ব্যবহার সে হারে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। তাই সুকুমার সেনের কথা আগেই বলেছি এখনো বলছি তিনি, আধুনিক বাংলায় চারটি কারকের কথা বলেছেন- ১। কর্তা ২। কর্ম ৩। করণ-অধিকরণ ৪। সম্বন্ধ পদ। [দুই একটি গৌণ-কর্ম ও অপাদান কারকের প্রাচীন পদ প্রচলিত ছিল, কিন্তু তা আর আধুনিক বাংলা কারকে ধরা হয় না।], অর্থাৎ তিনি করণ কারক রাখছেন, শুধু উপরোক্ত যে সম্প্রদান কারকের কথা বলেছি তা তিনি রাখছেন না। কারণ সম্প্রদান কারক-কে অপ্রধান কারক হিসেবে ধরা হয়। আর কর্তা, কর্ম, করণ-অধিকরণ, সম্বন্ধ পদ হল প্রধান কারক। কিন্তু এখানে কর্তা, কর্ম, করণ-অধিকরণ হল কারক এবং সম্বন্ধ পদ হিসেবে কারকে ব্যবহৃত হয়। বাক্যে এই সমস্ত কারকের ব্যবহার বেশি বলে ব্যাকরণে এগুলোকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

কারক যে সমস্ত ব্যাকরণগত সম্পর্কে গড়ে ওঠে তা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। ভাষাবিজ্ঞানের অনেক কয়েকটা ভাগ রয়েছে, তার মধ্যে কারক-বিভক্তি আলোচনা হয় মূল ভাষাবিজ্ঞানে বা Core language – এ।

ব্যাকরণের কোন কিছু ভালো ভাবে জানতে গেলে কারক-বিভক্তি ভালো ধারণা না থাকলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমরা যদি ভালো ভাবে ভেবে দেখি তাহলে দেখব, কোন কথা বলা বা লেখার ক্ষেত্রে সর্বদা কারক ব্যবহার করে থাকি। যেমন- আমি কথা বলি। এখানে 'আমি' টা হল [কর্তা] বলাটা হল [ক্রিয়া], আমরা ভালো করে জানি যে, কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক নিয়ে বাক্যে তৈরি হয়। এই রকম প্রতিনিয়ত আমরা কারক ব্যবহার করে থাকি। 'কে', 'কোথায়', 'কিসে', 'কার সাথে' ইত্যাদি দ্বারা প্রশ্ন করলে কারক সম্বন্ধে জানা যায়।

এছাড়া ভাষার ইতিহাস থেকে শুরু করে কারক-বিভক্তি ইতিহাস এবং তার ব্যবহার ও প্রয়োগ হয় কিভাবে তা উপরোক্ত আলোচনা দেখানোর চেষ্টা করেছি। তাই সর্বশেষ বলতে পারি যে, ভাষার ক্ষেত্রে কারক-বিভক্তির গুরুত্ব অপরিসীম।

গ্রন্থতালিকা

১। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৪২, 'ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সং।

২। আজাদ, হুমায়ন, ১৯৮৪, 'বাক্যতত্ত্ব', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩। সেন, সুকুমার, ২০১৮, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৪। সরকার, পবিত্র, ২০০৬, 'বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গে', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৫। দাশগুপ্ত, প্রবাল, ১৯৮৭, 'কথার ক্রিয়াকর্ম', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬। মজুমদার, পরেশচন্দ্র, ১৯৯৩, 'বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (দ্বিতীয় খণ্ড)', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৭। মজুমদার, অতীন্দ্র, ১৯৮৭, 'ভাষাতত্ত্ব', নয়া প্রকাশ, কলিকাতা।

৮। ভট্টাচার্য, বিজন বিহারী, ১৯৮৭, 'বাগর্থ', জিজ্ঞাসা, কলিকাতা।

৯। গোস্বামী, কৃষ্ণপদ, ২০০১, 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস', করুনা প্রকাশনী, কলকাতা।

১০। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৭৫, 'বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে', জিজ্ঞাসা, কলিকাতা।

১১। দাশ, নির্মল, ১৪০৭, 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ', রবীন্দ্রভারতী বিস্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

১২। মহামাত্র, তুষারকান্তি, ২০০৫, 'ভাষা ভাবনা (সম্পাদনা)', অবভাস, কলকাতা।

১৩। মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর, ২০০৭, 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

১৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচরিতা, ২০০৫, 'আধুনিক বাংলা ভাষাতত্ত্ব', প্যাপিরাস, কলকাতা।

১৫। চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ২০১২, 'বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

১৬। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, ২০০০, 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ', (২য় খণ্ড)', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

১৭। সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৯১, ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’, সম্পাদনা- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

১৮। চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ২০১৩, ‘বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ’, অরবিন্দ পাবলিকেশন, কলকাতা।

১৯। Anderson, Jhon M, 2006, ‘Modern Grammar of Case’, Oxford University press. New York.

২০। Butt, Miriam, 2006, ‘Cambridge University press’, Cambridge.

২১। Chatterji, Suniti kumar, 1963, ‘language and literature of Modern India’, Prakash Bhavan, Kolkata.

সারাংশ (Abstract)

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় আমরা সাত রকম কারক-বিভক্তি আলোচনা পেয়ে থাকি। কিন্তু এই সময়ে দাঁড়িয়ে এই সাত রকম কারকের ব্যবহার লক্ষ্য করি না। কোন কোন ভাষা বিজ্ঞানী সাত-আট রকম কারকের প্রয়োগ দেখিয়েছেন আবার কেউ কেউ শুধু আধুনিক কারকের ব্যবহারের অবস্থান সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত আলোচনার আলোকপাত করেছেন। কিন্তু আমার গবেষণার বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক যুগের কারকের আলোচনার পাশাপাশি প্রাচীন ও মধ্যযুগের কারকের আলোচনা করতে হয়েছে। কেননা কোন ব্যাকরণ শেখার জন্য তার আগের মুহূর্তের ইতিহাসগুলো একটু জানা প্রয়োজন। আমরা জানি কোন সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ হল ভাষা। ভাষার সঠিক ব্যবহারের জন্য ব্যাকরণ বিদ্যা শেখার প্রয়োজন হয়। আর এই ব্যাকরণ অন্যতম অংশ হল কারক-বিভক্তি প্রয়োগ বিদ্যা।

প্রাচীন বাংলা থেকে সংস্কৃতে সাতটি কারকের ব্যবহারের প্রচলিত রয়েছে, যথা— কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান/গৌণকর্ম, অপাদান, অধিকরণ কারক এবং সম্বন্ধ। আবার আধুনিক বাংলায় চার রকম কারক হিসেবে জানি, যথা — ১। কর্তা ২। কর্ম ৩। করণ-অধিকরণ ৪। সম্বন্ধ পদ। এবার এই কারক-বিভক্তির প্রয়োগগুলো কিভাবে প্রয়োগ দেখানো যেতে পারে তা আলোচনা করব। যেমন-

অধিকরণ কারক

যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ, বাক্যস্থিত ক্রিয়ার আধার বা স্থান, অথবা কাল বোঝায় তাকে আমরা অধিকরণ কারক বলে থাকি। ‘কোথায়, কিসে, কখন, কবে’ এই সমস্ত পদ-যুক্ত প্রশ্নের উত্তর করলে অধিকরণ কারক পাওয়া যায়। এবার প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগের অধিকরণ কারকের চিহ্ন ও উদাহরণ বর্ণনা করব—

প্রাচীন বাংলা— শূন্য বিভক্তি, -(অ)ই, এঁ/এ, -ত, -রে ইত্যাদি।

যেমন— ১। দুআরত চিহ্ন দেখইআ ২। গঅণে উঠিআঁ
‘ত’ [বিভক্তি] ‘এ’ [বিভক্তি]

মধ্য বাংলা— এঁ/এ, -ই, -ত/তে, -ক, কে, -রে ইত্যাদি।

যেমন— ১। তব ঘরে আসিতে। ২। চান্দরে চান্দকান্তি জিম পরিহাসঅ।
‘এ’ [বিভক্তি] ‘এ’ [বিভক্তি]

৩। আইনু তোমার বাস (এখানে কোন বিভক্তি বসছে না)

আধুনিক বাংলা— এ, তে ইত্যাদি।

যেমন— ১। জলে কুমীর। ২। ভোরে সূর্য ওঠে। ৩। বাড়িতে লোক আছে।
‘এ’ [বিভক্তি] ‘এ’ [বিভক্তি] ‘এ’ [বিভক্তি]

অধিকরণ কারকে বিভক্তির বিবর্তিত রূপের মধ্যে শুধু আধুনিক বাংলায় বিভক্তির প্রয়োগ কমে, প্রাচীন ও মধ্যবাংলায় যেরূপ বিভক্তির চিহ্ন লক্ষ করা যায় তা আধুনিক বাংলায় সেরূপ লক্ষ্য করা যায় না, এখানে শুধু ‘এ’ ‘তে’ বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়।

এই রকম ভাবে প্রত্যেকটি কারক-বিভক্তি আলোচনা করা হয়েছে এই গবেষণা নিবন্ধে। এছাড়াও বাক্যে কারকের ব্যবহার, কারকে ব্যাকরণগত সম্পর্ক, কারকের শ্রেণী বিভাগ এবং বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানীর কারক ধারণার মতামত ইত্যাদি।